প্রকাশনার ৩৬ বছর
অগ্রপথিক
জুন ২০২১
বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী
Bangladesh 50
মুজিব শতবর্ষ
MUJIB 100

প্রকাশনার ৩৬ বছর

অগ্রপথিক

সৃ জ ন শী ল মা সি ক

ছত্রিশ বর্ষ ❑ সংখ্যা ০৬
জুন ২০২১ ॥ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪২৮ ॥ শাওয়াল-জিলকদ ১৪৪২

প্রধান সম্পাদক
ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান

সম্পাদক
মোহাম্মদ আনোয়ার কবির

প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭

অগ্রপথিক

নিয়মাবলী

- অগ্রপথিক ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর সৃজনশীল মাসিক মুখপত্র।
- ইসলামের সুমহান জীবনাদর্শ প্রচার ও প্রসারে বিতর্কের ঊর্ধ্বে থেকে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, জীবনী, তথ্যমূলক ফিচারসহ সৃজনশীল লেখকদের গল্প, কবিতা, নাটক, স্মৃতিকথা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি,শিল্পকলা, অর্থনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক লেখা প্রকাশ এবং মননশীল পাঠক তৈরি করা অগ্রপথিকের প্রধান উদ্দেশ্য। পাশাপাশি বিশ্ব মুসলিম ঐতিহ্যের সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য।
- উদ্দেশ্যের অনুকূলে যে কেউ তাঁর নির্বাচিত মূল্যবান লেখাটি অগ্রপথিক-এ প্রকাশের জন্য পাঠাতে পারেন, তবে অবশ্যই স্পষ্ট ও নির্ভুল হতে হবে। কাগজের দুই পৃষ্ঠায় গ্রহণযোগ্য নয়। অগ্রপথিক-এর ই- মেইল ঠিকানায়ও লেখা পাঠাতে পারেন। অমনোনীত লেখা ফেরত দেয়া হয় না। প্রকাশিত লেখার সম্মানী দেয়া হয়। লেখা সম্পাদকের বরাবরে পাঠাতে হবে।
- ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় বিক্রয় শাখা (বায়তুল মুকাররম, ঢাকা) সহ বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে অগ্রপথিকসহ অন্যান্য প্রকাশনা কিনতে পাওয়া যায়।

প্রচ্ছদ
ফারজীমা মিজান শরমীন

মূল্য : ২০ টাকা

যোগাযোগ
সম্পাদক
অগ্রপথিক
প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা- ১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫১৯
E-mail : ifa.agropothik@gmail.com

স ম্পা দ কী য়

পবিত্র ঈদ-উল ফিতর শেষ হয়ে নতুন মাস আমাদের মাঝে এসেছে। এসময় ধর্মপ্রাণ মানুষেরা পবিত্র হজ্জের প্রস্তুতি গ্রহণ করার সময়। পবিত্র হজ্জ আমাদের ইসলাম ধর্মের পঞ্চ স্তম্ভের মধ্যে একটি অন্যতম স্তম্ভ। হজ্জের সময়ে সারাবিশ্ব থেকে লাখ লাখ মুসল্লি আল্লাহ তাআলার পবিত্র ঘর বায়তুল্লাহ শরীফ যিয়ারত ও মহানবী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাজার শরীফ যিয়ারত করে থাকেন। খুব কাছ থেকে স্বচক্ষে পবিত্র ইসলাম ধর্মের নিদর্শনগুলো দেখে নিজেদের ঈমানকে দৃঢ় করার সুযোগ লাভ করে থাকেন। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীর কারণে গত বছর সীমিত পরিসরে সৌদি আরবে অবস্থানরত অল্প কিছুসংখ্যক মুসল্লী ছাড়া সারাবিশ্ব থেকে আর কারো পক্ষে

পবিত্র হজ্জে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। বাস্তবতার কারণে সৌদি সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। এ বছরও একই অবস্থা বিরাজ করছে। সম্ভবত এবছরও সারাবিশ্ব থেকে কোন মুসল্লির পক্ষে হ্জ্জ করা সম্ভব হবে না। মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহতাআলার কাছে আমরা মুনাজাত জানাই সারাবিশ্ব থেকে যেন করোনা মহামারীর এই দুর্ভোগ অপসারিত হয়। সারাবিশ্বের সাধারণ মুসল্লিগণ যেন আগের মতো আল্লাহ তাঅলার পবিত্র ঘর বায়তুল্লাহ শরীফ যিয়ারত ও পবিত্র হজ্জ পালন করার স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফেরত আসে।

৬ দফা দিবস

আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ৬ দফাকে বাঙালির ঐতিহাসিক মুক্তিসনদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ৭ জুন ঐতিহাসিক ৬ দফা দিবস। রাজপথে তখন শ্লোগান উঠেছিল– ৬ দফার পথ ধরো/ বাংলাদেশ স্বাধীন করো। সমগ্র জনগণ ৬ দফার পক্ষে রাজপথে নেমে এসেছিলো। এই ৬ দফা দাবি আদায়ের আন্দোলনে শাহাদৎ বরণ করেছিলেন অসংখ্য বীর বাঙালি। ৬ দফা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর আতংকে পরিণত হয়েছিল। ঐতিহাসিক ৬ দফা দিবসের উপর আমরা এ সংখ্যায় বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী ও মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম এর দু'টি বিশেষ লেখা প্রকাশ করলাম। লেখা দু'টির মধ্য দিয়ে ৬ দফার অনেক অজানা বিষয় পাঠকেরা জানতে পারবেন।

অবিভক্ত ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগ্রামী নেতা মৌলভী আহমদউল্লাহ শাহ (র) ৫ জুন ১৮৫৮ সালে ব্রিটিশদের হাতে শাহাদাৎবরণ করেন। মোলভী আহমদউল্লাহ শাহর জীবন ইতিহাস সংগ্রাম সকল সময়ে আমাদের জন্য প্রেরণার উৎস। মৌলভী আহমদউল্লাহ শাহ (র)-কে নিয়ে আমরা এ সংখ্যায় একটি বিশেষ লেখা প্রকাশ করেছি।

গত বছর ১৩ জুন ২০২০ সালে মাননীয় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মাওলানা শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ (র) ৭৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছিলেন। ধর্ম মন্ত্রণালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশনসহ ধর্মীয় সেক্টরে উনার অবদান চির স্মরণীয়। এ বছর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে একটি বিশেষ লেখা প্রকাশ করা হলো। মহান রাব্বুল আলামিন মাওলাানা শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ (র)-কে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুক। আমীন।♦

সূচি

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

মুহাম্মদ মিযান বিন রমজান
ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী♦০৯

মুফতী শাইখ মুহাম্মদ উছমান গনী
ইসলামের আলোকে হিজড়াদের অধিকার♦২৩

৬ দফা দিবস

র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী
৬-দফা : স্বাধীনতার পথে এক অনন্য দলিল♦২৭

বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম
ছয় দফা সম্পর্কে আদালত♦৩৭

মুসলিম বীর

কাজী আখতারউদ্দিন
অবিভক্ত ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগ্রামী নেতা
মৌলভী আহমদউল্লাহ শাহ (১৭৮৭ জুন ১৮৫৮)♦৪৩

মুসলিম মনীষী

আ শ ম বাবর আলী
হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)♦৫২

মুজিববর্ষ

নাসরীন মুস্তাফা
সংস্কৃতিবান বঙ্গবন্ধু : বঙ্গবন্ধুময় সংস্কৃতি♦৫৯

মাহবুব রেজা
ইসলামের সেবায় শেখ হাসিনা পিতার পথে হাটছেন♦৮০

শ্রদ্ধাঞ্জলি

ড. জিল্লুর রহমান খান
এমন মানুষ বাংলায় আর আসবে না♦৮৫

স্মরণ

মিরাজ রহমান
শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ :
চির স্মরণীয় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী♦৮৯

কবিতা

শামসুল ফয়েজ
আজ কোন বাতি জ্বলছে না♦৯৬
মাহফুজ পারভেজ
বেঁচে থাকি♦৯৭
প্রত্যয় জসীম
জোছনার ফাঁদ♦৯৮
রনি অধিকারী
মায়াবী চোখের জলে♦৯৯
জব্বার আল নাঈম
ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাহি রাজেউন♦১০০
আরাফাত রিলকে
ফিলিস্তিন♦১০১
শেখ দুলাল
আষাঢ়ের কবিতা♦১০২
আবদুস সালাম খান পাঠান
বাংলা ভাষা ও প্রকৃতি চেতনা♦১০৩

গল্প

আহমেদ আব্বাস
একহাত অগ্রগামী♦১০৪

সাহিত্য

মুহম্মদ মতিউর রহমান
ইব্রাহিম খাঁ♦১১০

বিশ্ব পরিবেশ দিবস

মঈনুল হক চৌধুরী
বিশ্ব পরিবেশ দিবসে আমাদের ভাবনা♦১১৯

পরশমণি

আল-কুরআন

১। আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সে নিয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তাঁর দান অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হতে পার। *(আলে ইমরান : ১০৩)*

২। বলুন: হে আহলে কিতাবগন, তোমরা স্বীয় ধর্মে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না এবং এতে ঐ সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যারা পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। *(আল-মায়িদাহ : ৭৭)*

৩। নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার নিকট সমর্পিত। অতঃপর তিনি বলে তেবেন যা কিছু তারা করে থাকে।। *(আনআম : ১৫৯)*

আল-হাদীস

১। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুমিনের পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তার কিয়ামতের দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন সঙ্কটাপন্ন ব্যক্তির নঙ্কট নিরসন করবে, আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় সংকট নিরসন করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ দুনিয়া আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আর আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য করে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা নিজ ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে। *(মুসলিম শরীফ)*

২। মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন, ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয় যে তৃপ্তিসহকারে খায় অথচ তার প্রতিবেশী তার পাশে পড়ে থাকে অভুক্ত অবস্থায়। *(বায়হাকী শরীফ)*

৩। সরকারে দো-আলম (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হব। *(বুখারী শরীফ)*

৪। মহানবী (সা) বলেছেন, আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের জন্যই প্রেরিত হয়েছি। *(মুসনাদে আহমদ)*

ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর

সংক্ষিপ্ত জীবনী

মুহাম্মদ মিযান বিন রমজান

জন্ম ও নাম

ইমাম আবু হানীফা (র) ইরাকের কূফায় ৫ সেপ্টেম্বর ৬৯৯ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম নোমান ইবনে সামেত ইবনে যুতি। তাঁর ডাকনাম আবু হানিফা। পরবর্তী যুগে তিনি এই নামে প্রসিদ্ধিলাভ করেন এবং জগৎবাসী তাকে এই নামে চিনে।

শিক্ষাজীবন

আবু হানীফার বাবা ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। বাবা ব্যবসায়ী হবার সুবাদে ছোট থেকেই আবু হানীফা কায়-কারবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বাবার সঙ্গে বিভিন্ন সময় সুযোগে জাগায়-জাগায় আনাগোনাও করতে হতো। দুঃখের কথা, মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি পিতাহারা হন। এর বেশ কদিন আগে বাবার সঙ্গে হজ্জ পালন করার সৌভাগ্য হয়। বাবার মৃত্যুর পর ব্যবসার গুরুদায়িত্ব বর্তায় আবু হানীফার কান্দে (আল ফিকহুল আকবর)। তিনি অসামান্য দক্ষতা ও নিষ্ঠায় ব্যবসা প্রসারিত করার পাশাপাশি কাপড় তৈরির একটা কারখানা স্থাপন

করেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তা অন্য প্রতিষ্ঠানে রূপ নেয়। ব্যাবসায়িক হিসেবে তাঁর সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ব্যবসার সুবাদে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার প্রয়োজন হতো। ঘটনাচক্রে একদিন সাক্ষাৎ হয় ইমাম শা'বী (র)-এর সঙ্গে। ইমাম শাবী প্রথম পলকেই তার চাঁদনী কপালের চাঁদ দেখতে পান। তারপর তিনি আবু হানীফাকে ইলম শিক্ষার প্রতি উৎসাহ দান করেন। এরপর আবু হানীফা ইলম আহরণে নিমগ্ন হন। তখন বয়স হয়েছিলো উনিশ কি কুড়ি।

কে এই ইমাম আযম

সৃষ্টি নেযামের এক অভূতপূর্ব দিক সৃষ্টিকুলের আপসে ভিন্নতা। মূলত স্রষ্টার এ নেযাম নিরিবিলি তার অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে। মানুষ মানুষের ভিন্নতা। চেহারায় ভিন্নতা। সীরাত-সুরতে ভিন্নতা। সৌন্দর্যে ভিন্নতা। আদর্শ বুদ্ধি ও প্রতিভায় ভিন্নতা। শুধু মানুষের মাঝেই নয় এরকম ভাবে সকল সৃষ্টিকূলের মাঝে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। ভিন্নতার এহেন নেযাম না থাকলে বিশ্ব জাহানের রূপ– যে ভিন্নতায় ভরপুর তা সহজে অনুমান করা যেতো না। এ নেযামের সূত্র ধরে মানবজাতির আজ হাজারো শ্রেণি বিভাগ। তাইতো দেখা যায় কেউ অনুগত। কেউ অনুসৃত। কেউ আলোচিত, কেউ সমালোচিত। কেউ শ্রদ্ধাভাজন, কেউ ঘৃণার পাত্র। কেউ সত্য ন্যায়ের প্রতীক, কেউ ভ্রষ্টাচার পতাকাবাহী। কখনো সত্যের জয়, কখনো মিথ্যের। কারো বিয়োগ ব্যথায় অশ্রু ঝরে, আবার কারো বিয়োগে মিষ্টি বিতরণ। কেউ স্বপ্নদ্রষ্টা, কেউ খলনায়ক। বৈচিত্রের এই তলাটে ভিন্ন মানব ভিন্ন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তেমনি বর্ণনাতীত গুণে পরিবেষ্টিত মুসলিম উম্মার ইমাম, সর্বযুগের অনন্য মুক্তা, সর্বযুগের কিংবদন্তি, ইলমের সাগর ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। বলা চলে তিনি রাসূলের ভবিষ্যৎবাণীর ফসল। ইমাম আবু হানীফাকে আল্লাহ তায়ালা জ্ঞানের যে পূর্ণতা ইজতিহাদের যোগ্যতা কুরআন ও হাদিসের অগাধ জ্ঞান দান করেছেন। তা যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভবিষ্যৎবাণীর বাস্তব রূপ।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। সে সময় সূরা জুমা অবতীর্ণ হয় যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তেলাওয়াত করেন উপস্থিত লোকদের মধ্যে হতে একজন জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাঁরা কারা যারা আমাদের সাথে এখনো মিলিত হয়নি। রাসূল তখন উত্তর দেননি। তারপর আবারো জিজ্ঞেস করা হলে তিনি সালমান ফারসির কাঁধে হাত রেখে বলেন, যদি

ঈমান সুরাইয়া তারকা নিকটেও থাকে তবু এদের থেকে কেউ না কেউ নাগাল পাবে। [সহিহ বুখারী ও মুসলিম]

জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন– এ হাদীসে ইমাম আবু হানীফার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা একথা স্পষ্ট যে, আবু হানীফার সময়ে ফিকাহ এবং ইলমী মর্যাদায় কেউ তাঁর সমকক্ষ হতে পারেনি। ইলমে হাদীসের শিক্ষক শিক্ষার্থী প্রত্যেকেই এ বিষয়ে অবগত। অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণের মতে এ ভবিষ্যৎবাণী ইমাম আবু হানীফার ক্ষেত্রেই সঠিক প্রযোজ্য।

শাহ ওলি উল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলবী (র) বলেন– এই হাদিস নিয়ে আমরা একবার আলোচনা করছিলাম। আমি বললাম ইমাম আবু হানীফা সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ ইলমে ফিকার প্রচার-প্রসার সবচেয়ে বেশি তাঁর মাধ্যমেই ঘটেছে।তাঁর দ্বারা অনেকেই সংশোধন। সুতরাং সর্বশেষ প্রমাণিত হলো ইমাম আবু হানীফা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী সেই প্রাণপুরুষ।

অবয়ব আকৃতি পোশাকাদি

আবু হানীফার চেহারা ছিল অতি কামনীয় ও আকর্ষণীয়। তার দেহ ছিল মধ্যঙ্গী। গায়ের রং গোধূমী। সবসময়ই ভালো ভালো পোশাক এবং সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। সুগন্ধির কারণে পূর্ব থেকে তাঁর আগমন অনুমান করা যেতো। ছিলেন মিষ্টভাষী। গলার আওয়াজ মধুময়।

ব্যক্তিগত জীবন

আবু হানীফার সন্তানদের মধ্যে হাম্মাদ ব্যতীত আর কারও সন্ধান পাওয়া যায় না। তার নাম নিজ উস্তাদের নাম অনুসারে ছেলের নাম রেখেছিলেন হাম্মাদ। তিনি তার পিতার উত্তরাধিকারী ছিলেন। তাকওয়া পরহেজগারী তার পিতার নমুনা স্বরূপ।

ষোল বছর বয়সে হাজী

ইমাম আবু হানীফা বলেন– ১৬ বছর বয়সে ৯৬ হিজরীতে আমার পিতার সাথে হজ্বে গমন করি। যখন মসজিদে হারামে প্রবেশ করলাম, একটি হালকা দেখতে পেলাম। আব্বাকে জিজ্ঞেস করলাম এটা কার হালকা? তিনি বলেন এটা রাসূলে আকরামের সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন হারিস (রা)-এর হালকা। তারপর আমি নিকটবর্তী হয়ে তাকে এ কথা বলতে শুনলাম যে, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে আল্লাহ তা'আলা তার প্রয়োজন মিটিয়ে দেন। তার জন্য উত্তম রিজিকের ব্যবস্থা করেন।

উলূমুল হাদীস ও ইমাম আবু হানীফা (র)

উসূলে হাদীসের উপর ইমাম আবু হানীফা (র)-এর নিজের লেখা স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। তবে, উসুলে হাদীস সম্পর্কিত তার বেশকিছু বক্তব্য বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়। যেমন-

১। আবু হানীফা (র) বলেছেন, আমি জাবের আল জা'ফী থেকে বড় মিথ্যাবাদী এবং আতা ইবনে রাবাহ থেকে উত্তম কাউকে দেখিনি।

২। ইমাম সাওরী থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে কিনা জিজ্ঞাসা করলে ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, তার কাছ থেকে হাদীস লিখতে পারো। কেননা, তিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। তবে, হারীস থেকে আবু ইসহাক সূত্রে বর্ণিত এবং জাবের আল জা'ফীর কাছ থেকে গৃহীত হাদিসগুলো ছাড়া।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (র) বলেন, কুফায় আমাকে সর্বপ্রথম যিনি হাদীসের মজলিসে বসিয়েছেন তিনি হলেন ইমাম আবু হানীফা (র)। তিনি আমাকে মসজিদে বসিয়ে বলেছিলেন, মানুষকে এখানে বসিয়ে আমর ইবনে দীনারের হাদীসগুলো বর্ণনা করুন। আমি সেখানে বসে তা বর্ণনা করেছিলাম। (উসুলুদ্দিন ইনদা আবি হানিফা-১০৩)

শিক্ষাদান পদ্ধতি

ইমাম হাম্মাদের যখন ইন্তেকাল হয়, তখন আবু হানীফার বয়স ছিল চল্লিশ বছর। এ সময় তিনি উস্তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে তাঁর শিক্ষাকেন্দ্রের পূর্ণদায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি প্রথম যখন শিক্ষা দান শুরু করেন, তখন শুধুমাত্র ইমাম হাম্মাদের সাগরেদগণই তাতে শরীক হতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে তাতে কূফার সর্বস্তরের মানুষ, বিশিষ্ট জ্ঞানীগুনী, এমনকি ইমাম সাহেবের উস্তাদগণেরও কেউ কেউ এসে শরীক হতেন। বিখ্যাত তাবেয়ী মাসআব ইবনে কোদাম, ইমাম আমাশ প্রমুখ নিজে আসতেন এবং অন্যদেরকেও দরসে যোগ দিতে উৎসাহিত করতেন।

একমাত্র স্পেন ব্যতীত তখনকার মুসলিম-বিশ্বের এমন কোন অঞ্চল ছিল না, যেখানকার শিক্ষার্থীগণ ইমাম আবু হানীফার দরসে সমবেত হননি। মক্কা-মদীনা, দামেস্ক, ওয়াসেত, মুসেল, জাযিরা, নসীবাইন, রামলা, মিসর, ফিলিস্তিন, ইয়ামান, ইয়ানামা, আহওয়ায, উস্তর আবাদ, জুরজান, নিশাপুর, সমরকন্দ, বুখারা, কাবুল-হেমস প্রভৃতিসহ বিখ্যাত এমন কোন জনপদ ছিল না যেখান থেকে শিক্ষার্থীগণ এসে ইমাম আবু হানীফার নিকট শিক্ষা লাভ করেননি।

মুসলিম-বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জ্ঞানপিপাসা মিটানোর লক্ষ্যে সমবেত শিক্ষার্থীগণের বিচারেও ইমাম আবু হানীফা ছিলেন তাবেয়ীগণের মধ্যে কুরআন-

হাদীস এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞানী এবং তাকওয়া পরহেজগারীতে অনন্য ব্যক্তিত্ব। ইমাম সাহেবের অনুপম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বদৌলতে সে যুগে এমন কিছু সংখ্যক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয়েছিল, যাঁরা মুসলিম উম্মাহর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আকাশে এক একজন জ্যোতিষ্ক হয়ে রয়েছেন। ইমাম সাহেবের সরাসরি সাগরেদগণের মধ্যে ২৮ ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে কাজী (বিচারক) এবং শতাধিক ব্যক্তি মুফতীর দায়িত্ব পালন করেছেন। ইসালামের ইতিহাসে এক ব্যক্তির প্রচেষ্টায় এত বিপুল সংখ্যক প্রাজ্ঞ ব্যক্তির আবির্ভাব আর কোথাও দেখা যায় না।

প্রথম আব্বাসী খলীফা আবুল আব্বাস সাফফাহর পূর্ণ শাসন আমল (১৩২-১৩৬ হি.) চার বছর নয় মাস কাল ইমাম আবু হানীফা মক্কা শরীফে স্বেচ্ছা নির্বাসনে কাটান। কারণ, বনী-উমাইয়ার শাসন কর্তৃত্বের পতন ঘটানোর আন্দোলনে ইমাম আবু হানীফার প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। কিন্তু ইমাম সাহেব উমাইয়া বংশের পতনের পর আব্বাসিয়দের শাসন-ব্যবস্থা চাইতেন না। তাঁর মতানুসারী সে যুগের ওলামা-মাশায়েখগণ খোলাফায়ে-রাশেদীনের শাসন-ব্যস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা চাইতেন। কিন্তু আব্বাসীয়দের প্রথম শাসক আবু আব্বাস অকল্পনীয় নির্মমতার আশ্রয় গ্রহণ করে ওলামা-মাশায়েখগণ এবং ধর্মপ্রাণ জনগণের সে আকাঙ্ক্ষা নস্যাৎ করে দেয়। এই পরিস্থিতিতে ইমাম সাহেবের পক্ষে কূফায় অবস্থান মোটেও নিরাপদ ছিল না।

শুভাকাঙ্খীদের পরামর্শে ইমাম সাহেব তখন মক্কা শরীফ চলে যান এবং আবুল আব্বাসের মৃত্যুকালে (যিলহজ্জ ১৩৬) পর্যন্ত মক্কা শরীফেই অবস্থান করেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মক্কার পবিত্র মসজিদে ইমাম আবু হানীফা নিয়মিত দরছ দিতেন। হাফেয যাহাবীর বর্ণনা অনুযায়ী তখনকার দিনে ইমাম সাহেবের দরছে যেমন হাদিসের ছাত্রগণ দলে দলে যোগ দিতেন, অনুরূপ বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের আলেমগণও বিপুল সংখ্যায় সমবেত হতেন।

ফিক্বহের মাসয়ালা কার কাছ থেকে গ্রহণ করতেন

ইমাম আবু হানীফা (র) কয়েকজন সাহাবীর সাক্ষাত পেলেও তাদের কাছ থেকে সরাসরি শিক্ষাগ্রহণ করতে পারেননি। তবে, সাহাবীদের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন এমন লোকদের কাছ থেকে তিনি শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। তিনি সে সমস্ত সূত্র থেকে মাসয়ালা গ্রহণ করেছেন সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল– উমর (রা)-এর সঙ্গীদের মাধ্যমে উমর (রা)-এর কাছ থেকে, আলী (রা)-এর সঙ্গীদের মাধ্যমে আলী (রা)-এর কাছ থেকে এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর সঙ্গীদের মাধ্যমে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এর কাছ থেকে।

আবু হানীফা (র)-এর প্রশংসায় উলামায়ে ইসলাম

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর প্রশংসা নিয়ে জগৎবিখ্যাত ওলামায়ে কেরামদের বেশকিছু বক্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের বক্তব্য নিম্নে তুলে ধরছি–

১। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেছেন, ফিক্বহের ব্যাপারে মানবজাতি ইমাম আবু হানীফা (র)-এর পরিবারভুক্ত।

২। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন (র) বলেন, তিনি হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য এবং নিরাপদ ব্যক্তি ছিলেন; আমি কাউকে শুনিনি তাকে দুর্বল বলতে। (উমদাতুল ক্বারী-৬/১২)

৩। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক সুত্রে বর্ণিত, ফিকহে সর্বাধিক জ্ঞানী ছিলেন ইমাম আবু হানীফা (র)। আমি ফিকহে তার মত আর কাউকে দেখিনি। তিনি আরও বলেন, যদি আল্লাহ তায়ালা আমাকে আবু হানীফা ও সুফিয়ানের দ্বারা সাহায্য না করাতেন তাহলে আমি অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতই থাকতাম। (তাহযীবুত তাহযীব-১০/৪৫০)

৪। আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন, তিনি ইলম, তাকওয়া, যুহদ ও আখিরাতকে অগ্রাধিকার দেয়ায় ছিলেন অতুলনীয়। আবু জাফর মানসুরের অধীনে তিনি বিচারকের দায়িত্ব পালন করতে অস্বীকৃতি জানালে তাকে চাবুক দিয়ে প্রহার করা হয়। আল্লাহ তায়ালা তার উপর রহমত করুন।

৫। তার ইন্তিকালের সংবাদ শুনে শুবা ইবনে হাজ্জাজ আল আতকী (র) বলেন ইমাম আবু হানীফা (র)-এর সাথে কূফার ফিক্বহ চলে গেল। আল্লাহ তায়ালা তার এবং আমাদের উপর রহমত করুন।

৬। হাসান ইবনে সালেহ বলেন, নুমান বিন সাবেত (আবু হানীফা র. এর আসল নাম) ছিলেন অনেক জ্ঞানী আলেম যিনি অত্যধিক পরিমাণে যাচাই বাছাই করে জ্ঞানার্জন করতেন। তার কাছে রাসূল (সা)-এর কোন হাদীস সহীহ প্রমাণিত হলে সেটা ছেড়ে অন্য কোন দিকে পা বাড়াতেন না।

৭। ইমাম আবু দাউদ সাজিস্তানী বলেন, আল্লাহ তায়ালা মালেকের উপর রহম করুন, তিনি ইমাম ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা শাফেয়ির উপর রহম করুন তিনি ইমাম ছিলেন, আল্লাহ তায়ালা আবু হানীফার উপর রহম করুন, তিনি ইমাম ছিলেন।

৮। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন, যদিও কিছু বিষয়ে লোকেরা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর বিরোধিতা করে থাকে এবং তার সিদ্ধান্ত দেয়া বিষয়গুলোকে প্রত্যাখ্যান করে তবে, কেউ কখনো তার জ্ঞান-গরিমা, বুঝ শক্তি নিয়ে সন্দেহ করেনি।

৯। ইমাম যাহবী (র) বলেন, তিনি ছিলেন ইমাম, মুত্তাকী আলেম, অনেক সম্মানি বান্দা; তিনি কখনও বাদশাহদের পুরস্কার গ্রহণ করতেন না।

১০। হযরত ফুযাইল ইবনে আইয়্যাজ (র) বলেন, আবু হানীফা (র) ছিলেন কম কথা বলা, বেশি কাজ করা এবং জ্ঞান ও জ্ঞানীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী হিসেবে সমধিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। (উসুলুদ্দিন ইনদা আবি হানিফা-৬৯)

ইজতিহাদী মূলনীতি

অন্যান্য মুজতাহিদ ওলামায়ে কেরামদের মত ইমাম আবু হানিফা (র)-এরও কিছু ইজতিহাদী মূলনীতি রয়েছে। সেসব মূলনীতির উপর ভিত্তি করে তিনি ইজতিহাদ করেছেন। তার এ মূলনীতি সম্বন্ধে 'আখবারু আবি হানিফা ও আসহাবিহি' গ্রন্থে বলা হয়েছে–

আমি আল্লাহ তায়ালার কিতাব থেকে মাসয়ালা গ্রহণ করি যখন তাতে তা পেয়ে থাকি। যদি তাতে তা না পাই তাহলে রাসূল (সা)-এর হাদীস থেকে যা নির্ভরযোগ্য বর্ণনার মাধ্যমে এসেছে তা থেকে গ্রহণ করি। আর যদি আল্লাহর কিতাব কিংবা রাসূল (সা)-এর হাদীসের মধ্যেও সেটা না পাই তাহলে, সাহাবীদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তার বক্তব্য থেকে গ্রহণ করি এবং যার বক্তব্য ইচ্ছা পরিহার করি। তাদের বক্তব্য থেকে অন্য কোথাও যাই না। আর যখন বিষয়টি ইবরাহীম, শা'বী, হাসান, ইবনে সিরীন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব (এভাবে আরও কয়েকজনের নাম গণনা করে বললেন) প্রমুখ ব্যক্তিদের কাছ থেকে আসে, তারা ইজতিহাদ করে আমিও তাদের মত ইজতিহাদ করি। (আখবারু আবি হানিফা– ১/২৪)

সিয়ারে আ'লামিন নুবালাতে বলা হয়েছে– রাসূল (সা)-এর পক্ষ থেকে যা এসেছে তা মাথা ও চোখের উপর রাখি, যা সাহাবীদের থেকে এসেছে তা থেকে আমরা নির্বাচন করব। আর যা অন্যদের থেকে এসেছে তাতে তারাও মানুষ আমরাও মানুষ (আমরাও তাদের মত ইজতিহাদ করব)। (সিয়ারু আলামিন নুবালা– ৬/৪০১)

দান-দাক্ষিণ্য

ইলমের রাজা ইমাম আবু হানীফা (র)। রাব্বুল আলামীন তাকে যেমন দান করেছেন। এমন ধন-দৌলত। ধন-মন উভয়টা ছিলো তাঁর। খোলা হাতে চোখ বুজে দান করতেন। আসলে বড় বড় ব্যক্তিদের এমন কতক গুণাবলী থাকে যা সচরাচর অন্যদের মধ্যে পাওয়া যায় না। ঠিক তেমনি তুলনাহীন দানবীর ছিলেন আবু হানিফা। ইলম সম্পর্কে খোলামেলা আলোচনা হলেও দান সম্পর্কে সে আকারে আলোচনা হয় না। তিনি ইলমের ক্ষেত্রে যেমন আজম তথা সবার বড়। দান খয়রাতের বেলাও আজম।

আবু হানীফা দাওয়াতি আয়োজনে অংশ নেন। বহু মানুষের সমাগম হয় সেখানে। পুরাতন ছিঁড়াফাটা গায়ে এক ব্যক্তির প্রতি তাঁর নজর আটকে। তারপর বিষয়টা মনে মনে ধরে রাখেন। আয়োজন শেষ। যে যার মতো পথ হাঁটছে। তিনি ওই লোকটাকে ইশারা দিয়ে বসতে বলেন। ইশারা টের পেয়ে লোকটা বসে থাকে। ততোক্ষণে সবাই গায়েব। বসে রইলেন আবু হানীফা আর লোকটা। তখন গোপনে হতদরিদ্র লোকটাকে ১০০০ দেরহাম দান করেন। টাকা পেয়ে দরিদ্র লোকটা কি-যে একটা হাসি দিল...!

এক দরিদ্র আলেম প্রয়োজনের তাগিদে এক ব্যক্তি থেকে ৪০০০ দেরহাম ধার করেন। অভাবের তাড়নায় টাকা শোধ করতে পারছেন না। তারিখ দিয়ে তারিখ মিস করছেন বরাবরই। অবশেষে ঋণদাতা তাকে ধরে বন্দি করে রাখে। ঋণ শোধ না করা পর্যন্ত গোলামের মতন কাটতে হবে। কোনো মারফতে এই সংবাদটা পৌঁছে আবু হানীফার কানে। সঙ্গে সঙ্গে চার হাজার দেরহাম শোধ করে তাকে মুক্ত করে দেন।

গরিব দুঃখীর বেদনার সমভাগী ছিলেন আবু হানীফা। তাই তার একটা অভ্যাস ছিলো নিজের জন্যে যা খরিদ করতেন, অন্যের জন্য তাই করতেন। নিজ পরিবারের জামাকাপড় কিনলে, গরিব মিসকিন এতিম ও দরিদ্র আলেমদের জন্যেও ক্রয় করতেন। মোটকথা যখন যা যা কিনবেন, অন্যদেরকেও তা তা দান করতেন। [আল্লাহ ওয়ালু কী মাকবুলীয়াত কা রায ৯৭]

আবু হানীফার ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ। তিনি বলেন– আমার উস্তাদ আবু হানীফা দীর্ঘ ১০ বছর পর্যন্ত আমার পরিবারের সকল খরচাপাতি নিজে বহন করেছেন। এই উদার ব্যবহার শুধু আমার সাথে করেছেন, তা কিন্তু নয়। এমন আরও কতশত শাগরেদ হবে যাদের পড়ালেখার ভরণ পোষণ ছিলো আবু হানীফার কাধে।

শাগরেদদের হাদিয়া তোহফা দিতেন চোখ বুজে। কেউ মুখের উপর প্রশংসা করলে বেজায় রাগ করতেন। আবু হানীফা আত্মীয়দের মাঝে দান করতেন বেশি বেশি। কারণ আত্মীয়রা দান-সদকা পাবার হকদার বেশি। একবার অপরিচিতকে দান করেন। সে তো মহা খুশি। খুশির ঠেলায় আবু হানীফার প্রশংসা শুরু করে। আবু হানীফা রাগান্বিত হয়ে বলেন– আফসোস! আপনি আমার প্রশংসা করছেন...? প্রশংসা পাবার যোগ্য আল্লাহপাক। এই টাকা তো তিনি দান করেছেন। আমি শুধু মাধ্যম হয়ে আপনার কাছে পৌঁছে দিয়েছি।

মায়ের সেবা

আবু হানীফার মা-বাবা বড়ই নেককার ছিলেন। ব্যবসার ব্যস্ততা সত্ত্বেও ধর্মীয় জীবন যাপন করতেন। আলেমদের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। তার বাবা

তাবেঈ ছিলেন। বাল্যকালে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর জিয়ারত লাভ করেন। এবং তার দোয়া প্রাপ্ত হন। হযরত আমর বিন হুরাইছ মাখযামী (রা)-এর বাড়িতে তার দোকান ছিল। সকাল সন্ধ্যায় তার সাথে সাক্ষাত হতো। তার পুত্রকে নিয়ে তিনি হজ্জে যেতেন। সেখানে পিতা-পুত্র উভয়েই হযরত আব্দুল্লাহ বিন হারেস এর সাথে সাক্ষাত করেন। আবু হানীফা তার পিতা মাতার খেদমতের জন্য সদাসর্বদাই প্রস্তুত থাকতেন। তাদের ইন্তেকালের পর সদা তাদের জন্য দোআ করতেন। তিনি বলেন– আমি আমার নেক আমলগুলোকে তিন ভাগ করেছি। একভাগ নিজের জন্য। আরেক ভাগ মা-বাবার জন্য। আরেক ভাগ আমার উস্তাদ হাম্মাদের জন্য। আবু হানীফার পিতা আগে মারা যায়। তার মা পরে ১৩০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। এজন্য সেবা করার সুযোগ হয়েছিল। কাজী আবু ইউসুফ বলেন– ছাত্রজীবনে আবু হানীফা তার মায়ের কোন কথা অমান্য করতেন না। এমনকি উমর বিন যারের মজলিসে যাওয়ার সময় তার মাকে বাহনের উপর বসিয়ে নিয়ে যেতেন।

তাঁর খোদাভীরুতা

তিনি সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত এশার নামাযের ওযু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছেন। এতে এটাই বোঝা যায় যে, তিনি সারারাত আল্লাহর ইবাদত, ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণায় মগ্ন থাকতেন। কতিপয় কর্মচারীর দ্বারা ব্যবসা পরিচালনা করতেন। ব্যবসায় যাতে হারাম অর্থ উপার্জিত না হয় সে জন্য তিনি কর্মচারীদের সব সময় সতর্ক করতেন। একবার তিনি দোকানে কর্মচারীদের কিছু কাপড়ের দোষ-ত্রুটি দেখিয়ে বললেন, 'ক্রেতার নিকট যখন এগুলো বিক্রি করবে তখন কাপড়ের এ দোষগুলো দেখিয়ে দেবে এবং এর মূল্য কম রাখবে।' কিন্তু পরবর্তী কর্মচারীগণ ভুলক্রমে ক্রেতাকে কাপড়ের দোষত্রুটি না দেখিয়েই বিক্রি করে দেন। এ কথা তিনি শুনতে পেয়ে খুব ব্যথিত হয়ে কর্মচারীদের তিরস্কার করেন এবং বিক্রিত কাপড়ের সমুদয় অর্থ সদকা করে দেন। তাঁর সততার এ রকম শত শত ঘটনা রয়েছে।

মিথ্যা অভিযোগ

যেমনিভাবে বিভিন্ন কিতাবে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ আবু হানীফার গুণাবলি প্রকাশ করেছেন, তদ্রুপ কিছু হিংসুটে সমালোচনার খাতাও খুলেছে। বিশেষ করে, তারিখে বাগদাদ নামক কিতাবে খতিবে বাগদাদ আবু হানীফার সম্বন্ধে সমালোচনা মূলক কিছু কিছু মন্তব্য উল্লেখ করেছেন। যেগুলো ভিত্তিহীন মিথ্যা অভিযোগ ছাড়া আর কিছু নয়।

আবু হানীফার সমসাময়িক মুহাদ্দিসগণের মধ্য হতে যারা তার সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছেন, তাদের অধিকাংশই পরবর্তীতে প্রত্যাবর্তন করেছেন।

যেমন ইমাম সুফিয়ান সাওরী ইমাম আওযায়ী এমন আরো অনেকে। তারা আবু হানীফা সম্বন্ধে যেসব বিরূপ মন্তব্য করেছেন। এর দ্বারা আবু হানীফার নিশ্চয়তা এবং নির্ভরযোগ্যতা আরো দৃঢ় হয়েছে। কারণ তারা তাদের পূর্বের কথা থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, তাদের নিকট পরিষ্কার হয়ে গেছে তারা আবু হানীফার সম্বন্ধে যেসব দোষারোপ করেছেন আবু হানীফা তা হতে পবিত্র।

আবু হানীফার ব্যাপারে যাদের পক্ষ থেকে এ অপবাদ ছিল যে, তিনি হাদিস জানতেন না। হাদিসের বিপরীতে নিজমতো আমল করতেন। পরবর্তীতে তারা তার বিরোধিতা থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর আবু হানীফার প্রশংসায় মেতে ওঠেন। তাহলে এতে নিশ্চিত রূপে বুঝা যায় তাদের প্রদত্ত অপবাদগুলো ভিত্তিহীন। এরপরও যারা আবু হানীফাকে নিয়ে আকথা-কূকথা রটায়। তাদের নির্ভরযোগ্যতা জাতির জানা হয়ে গেছে।

হাদিস কম বর্ণনা করার কারণ

আবু হানীফার মূল বিষয় ছিল ফিকহ এবং ইজতেহাদ। তাই তিনি হাদীসের ব্যাপারে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতেন। হাদিস বর্ণনা করার চেয়ে গবেষণা করার প্রতি অতি মনোযোগী ছিলেন। এ কারণে বাহ্যিক দৃষ্টিতে তার বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা কম মনে হয়। এ বিষয়টিকে অবলম্বন করে এক শ্রেণির লোকেরা তার নামে মিথ্যা বুলি আওড়ান। অথচ অধিক সর্তকতা অবলম্বন করার কারণে আবু হানীফার মতো অন্যান্য ইমামগণের বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা তুলনামূলক অনেক কম। যেমন ইমাম মালেকের বর্ণিত হাদিসের সমষ্টি শুধুমাত্র মুয়াত্তা মালেক কিতাব। হাদিসের অন্যান্য কিতাবের তুলনায় এ কিতাবটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তাই বলে এর অর্থ এই নয় যে, ইমাম মালেক হাদিস জানতেন না। বরং তিনি হাদিসের ব্যাপারে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করেছেন এবং অধিক হাদিস বর্ণনা করা থেকে বিরত থেকেছেন।

ইবনে আবি হাতেম বর্ণনা করেন– আমি ইয়াহিয়া বিন মাইনকে জিজ্ঞেস করলাম যে, ইমাম মালেকের হাদিস বর্ণনা কম কেন? তিনি বললেন, অধিক সতর্কতা এবং যাচাই-বাছাইয়ের কারণে এরূপ হয়েছে। স্বয়ং ইমাম মালেক বলেন– আমি ইবনে শিহাব জহুরীর থেকে অনেক হাদিস শ্রবণ করেছি। কিন্তু সেগুলো আমি কখনো রেওয়ায়ত করিনি এবং করব না। এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এগুলো অনুসরণে আমল করা হয় না।

ইমাম মালেকের মৃত্যুর পর তার কিতাবগুলো বের করা হলে দেখা গেলো সেখানে ইবনে উমরের অনেক হাদীস রয়েছে। কিন্তু মুয়াত্তায় সে সব হাদিস

থেকে মাত্র দুটি হাদিসকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইমাম শাফি (র) বলেন– ইমাম মালেক হাদিসের অংশবিশেষে সন্দেহ হলে পুরো হাদিস বাদ দিয়ে দিতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাব বলেন, মানুষের ইলম বৃদ্ধি পেতে থাকে আর হাদিসের ব্যাপারে ইমাম মালেক এর ইলেম কমতে থাকে।

ঠিক তদ্রুপ আবু হানীফাও হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। এ বিষয়ে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা)-এর অনুসারী ছিলেন। যার অবস্থা এই যে, তিনি সহজে, কালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন না। আর যখন এ বাক্য বলতেন তখন শরীরের কম্পন এসে যেত। চেহারা বিবর্ণ হতো– আর আবু হানীফা হাদিস বর্ণনা হতে গবেষণাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং কুরআন হাদিস থেকে মাসআলা বের করার পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তাই বিধানবিশিষ্ট হাদিসগুলোর প্রতি জোর দিয়েছেন। যেগুলো নিয়ে গবেষণা ইজতেহাদ করেছেন।

অল্পসংখ্যক হাদীস বর্ণনার অপবাদ খণ্ডন

আবু হানীফা থেকে বর্ণিত হাদিস সংখ্যা খুবই কম। এটাকে ভিত্তি করে সমালোচকরা সুযোগ করে অপবাদ দেয় যে, আবু হানীফার হাদিসের জ্ঞান খুবই সীমিত। মূলত কারো বর্ণিত হাদিসের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তার হাদিসের জ্ঞান নির্ণয় করা যায় না। কারণ অল্প সংখ্যক হাদিস বর্ণনা করায় হাদিসের জ্ঞান সীমিত হওয়া বুঝায় না। যদি তাই হতো তাহলে আপনি উমর (রা), আলী (রা) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এর ব্যাপারে কি বলবেন?

উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা মাত্র ৫৪৫। অথচ তিনি ছিলেন প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। রাসূল (সা) তার ব্যাপারে বলেছিলেন, আমার পরে কেউ নবী হলে উমর হতেন।

রাসূলের জামাতা হযরত আলী (রা)ও সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। ২৪ বছর রাসূলের সাথে ছিলেন। রাসূল তাকে বলেছিলেন আমি হলাম মদীনার ইলমের শহর। আলী হলেন সেই শহরের দরজা। অথচ তার হাদিসের বর্ণিত ৫৮৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর হাদিসের সংখ্যা মাত্র ৪৮টি। অথচ তিনি ২২ বছর যাবত রাসূলের খেদমতে ছিলেন।

তাদের প্রত্যেকেই বর্ণিত হাদিস থেকে আরো অনেক বেশি হাদিস জানা ছিলো কিন্তু অত্যাধিক সর্তকতা অবলম্বন করার কারণে খুবই কম হাদীস বর্ণনা করেছেন। কারণ হাদিস বর্ণনায় সামান্যতম ভুল হলে ভয়াবহ শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। এমন কি তারা সরাসরি রাসূলের দিকে সম্পৃক্ত করে হাদিস বর্ণনা

করতেন না। অবশ্য তারা মাসায়ালা এবং ফতোয়া আকারে হাদিস বর্ণনা করতেন। আল ইসাবা গ্রন্থে উল্লেখ আছে হযরত উমর (রা), হযরত আলী (রা), আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা), আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), যায়েদ বিন সাবেত (রা), আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখের ফতোয়া এত অধিক যে, সেগুলো সংকলন করলে প্রত্যেকেরই ফতোয়ার একেকটি কিতাব হয়ে যাবে। অথচ তাদের হাদিস বর্ণনার সংখ্যা একেবারে কম।

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আবু হানীফা (র) ঠিক ওই সকল সাহাবায়ে কেরামের মত পথ অনুসরণ করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অনেক হাদিস জানা থাকা সত্ত্বেও সতর্কতা বসত বর্ণনা করেননি। যদি মিথ্যা বলা হয়ে যায়, তাহলে তো জাহান্নাম অবধারিত। কারণ রাসূল (সা) বলেছেন, যে আমার ব্যাপারে একটি মিথ্যা বলবে। সে যেন তার স্থানকে জাহান্নামে বানিয়ে নিল।

আবু হানীফা (র) অল্প সংখ্যক হাদিস বর্ণনা করার অপবাদের আরেকটা উত্তর হলো হাদিস মূলত দুই প্রকার। প্রথম প্রকারের হাদিস আহকামের সাথে সম্পৃক্ত। দ্বিতীয় প্রকারের হাদিস আহকামের সাথে সম্পৃক্ত নয়।

দ্বিতীয় প্রকারের হাদিস বর্ণনা করার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন এমনকি খুলাফায়ে রাশিদীন এ প্রকারের হাদিস বর্ণনা করা থেকে বিরত রয়েছেন। অন্যান্যদের কেউ বর্ণনা করা থেকে নিষেধ করেছেন।

আর প্রথম প্রকারের হাদিস আহকামের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে সেগুলো বর্ণনা করা থেকে নিষেধ করতেন না। বরং সেগুলো বর্ণনা করার জন্য জোর তাগিদ দিতেন।

উমর (রা) খলিফা হবার পরে বলেন, তোমরা রাসূলের হাদিস বর্ণনা করো তবে যেগুলো আমল করা প্রয়োজন সেগুলো বেশি বেশি বর্ণনা করো। প্রসিদ্ধ তাবেয়ী মসরুক (র) বলেন– আমি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলাম সমস্ত জ্ঞানের উৎস হচ্ছেন হযরত ওমর, আলী, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, যায়েদ বিন সাবেত, আবু দারদা এবং আবু উবাই রাযিল্লাহু। এরপর আরো গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলাম এদের সবার সমস্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার হচ্ছেন আলী এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ। অসতর্কতার কারণে তারা একেবারে কম হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু হানীফা (র)ও ঠিক তাই করেছেন। শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র) বলেন– আবু হানীফার (র) শিক্ষক ইব্রাহিম নাখয়ী তার মাযহাবের ভিত্তি রেখেছেন হযরত আলী এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা এর বর্ণিত

মাসায়েল ফতোয়ার উপর। ইব্রাহিম নাখয়ী ছিলেন কূফার সমস্ত আলেমদের জ্ঞান ভাণ্ডার। তার ফিকহার অধিকাংশ মাসয়ালাই সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত। তিনি সেসব মাসায়ালা গ্রহণ করেছেন যেগুলো সহিহ হাদিসের আলোকে নির্ভুল।

১৭ টি হাদিস বর্ণনা করার মিথ্যা অপবাদ

যে সমস্ত লেখক বিভিন্ন জন থেকে আবু হানীফার সমালোচনা কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন হলেন খতিবে বাগদাদ। তিনি লিখেছেন–

★আবু হানীফা হাদিসের ব্যাপারে এতিম এবং পঙ্গু। তিনি হাদিসের লোক ছিলেন না।

★আবু হানীফার নিকট হাদিসের জ্ঞান ছিল না। তার বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে ১৫০ টি। এর মধ্যে তিনি ভুল করেছেন।

ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন তার ইতিহাসের মুকাদ্দামায় লিখেন– আবু হানীফার বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ১৭ টি পর্যন্ত পৌঁছেছে বলে কথিত আছে। বাস্তব জগতে এটা কতটুকু সঠিক আমরা একটু আগেই বলেছি।

পাঠকদের সামনে এসব অপবাদের জবাব তুলে ধরা হলো–

★ ইমাম আবু হানীফা সর্বজনস্বীকৃত ইমাম এবং মুজতাহিদ ছিলেন। খতীবে বাগদাদ যাদের উক্তি থেকে সংকলন করেছেন, তারাও পরে নিজ নিজ মন্তব্য থেকে ফিরে আসেন। তারপর একমত হয়ে যান।

এখন প্রশ্ন জাগে ইমাম আবু হানীফা (র) যখন হাদিস জানতেন না, মাত্র ১৭টি হাদিস মুখস্থ ছিল, তখন কি করে অন্যান্য ইমাম এবং মুজতাহিদগণ তার ইজতেহাদ গ্রহণ করেছেন? এবং তার ফিকহী মাসায়েল শিক্ষা করে প্রচার-প্রসারের আয়োজন করেছেন?

★হানাফী ফিকহের গবেষণায় পাঠকগণ হাজার হাজার মাসায়ালা এবং আহকাম সহিহ হাদিসের অনুরুপ পেয়েছেন। সাইয়্যেদ মুর্তাজা জুবায়দী (র) হানাফী মাযহাবের আহকাম সম্পর্কিত হাদিসগুলো 'আদ্দুরারুল মুনীফা ফি আদিল্লাতি আবি হানিফাতা' নামক কিতাবে সংকলন করেছেন।

★ইবনে আবী শাইবা (র) এর মতে আবু হানীফা (র)-এর এমন মাসায়ালার সংখ্যা মাত্র ১২৫ টি যেগুলো সহিহ হাদিসের অনুকূলে নয়।

তার এ কথাটি সঠিক মেনে নিলে এর অর্থ দাঁড়ায় যে, গুটি কতক মাসায়ালা ব্যতীত অন্য সব মাসায়ালা সহিহ হাদিস মোতাবেক। আর আবু

হানীফার গবেষণালব্ধ এক বর্ণনামতে ৮৩ হাজার। অন্য বর্ণনামতে ১২ লাখ। অর্থাৎ প্রায় ১২ লাখ মাসায়ালা সহিহ হাদিসের অনুসারে। তাহলে একথা প্রমাণিত হয় যে, তিনি হাদিসের বিরাট একটা অংশের জ্ঞানী ছিলেন। যেগুলো থেকে তিনি এ সমস্ত মাসায়ালা উদঘাটন করতেন।

★ উসূলে হাদীসের কিতাবে আবু হানীফা (র)-এর মতামত সংকলিত হয়েছে। অর্থাৎ কোন রাবি গ্রহণযোগ্য কি বর্জনযোগ্য এব্যাপারে তার মত গ্রহণযোগ্য। এমন ব্যক্তিত্বকে হাদীসের ব্যাপারে রিক্তহস্ত বলা কি মিথ্যা অপবাদ নয়?

★ আবু হানীফার শিষ্যগণ তার থেকে শ্রুত এবং পঠিত হাদিসগুলো কিতাব আকারে সংকলন করেছেন। সংকলনকারীগণ ছিলেন বিশিষ্ট ইমাম এবং মুজতাহিদ। ইমাম আবু ইউসুফ (র), ইমাম মোহাম্মদ (র), ইমাম হাসান (র), ইমাম জাফর (র) সহ আরো অনেকে। আবু হানীফার মুসনাদে আহমদ এর সংখ্যা ১৭ টি।'জামিউল মাসানি' নামক কিতাবে এর অনেকগুলো সন্নিবেশ করা হয়েছে।

ইবনে খালদুন বলেছেন, আবু হানীফার বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ১৭ টি। এর এক ব্যাখ্যা এমন হতে পারে যে, তার মুসনাদের সংখ্যা ১৭টি। অথবা এমনও হতে পারে যে, ইমাম মুহাম্মদ আবু হানীফা থেকে বর্ণিত হাদিসের ১৩ টি। আর আবু হানীফা থেকে চারটি। মোট সতেরোটি। এর উপর ভিত্তি করেই বলা হয় ইমাম সাহেবের বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ১৭ টি। অথচ এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন মিথ্যা অপবাদ। ইবনে খালদুন ব্যতীত আর কেউ এমন কথা উল্লেখ করেননি।

ইন্তেকাল

১৫ শাবান রজব ১৫০ হিজরী মোতাবেক ৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি কারাগারে ইন্তেকাল করেন। বাগদাদের কাজী হাসান ইবনে আম্মারাহ গোসল দেন এবং কাফন পরান। যোহরের পর প্রথম জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় অসংখ্য-অগণিত লোকজন শরিক হন। আসরের নামাযের পর ওসিয়ত অনুযায়ী খায়জরান কবরস্থানে দাফন করা হয়।♦

ইসলামের আলোকে হিজড়াদের অধিকার

মুফতী শাইখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

মহান আল্লাহর সৃষ্টির সেরা হলো মানুষ। মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন নারী ও পুরুষ রূপে। হিজড়া হলো মনোদৈহিক বৈকল্য বা শরীরবৃত্তিয় ও মনোজাগতিক বিকাশের অপূর্ণতা। এটি হরমোনঘটিত একটি সমস্যা। শরীরের যে হরমোনের কারণে একজন মানুষ পুরুষ বা নারী বৈশিষ্টের অধিকারী হয়, সে হরমোন পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকাই এর প্রধান কারণ। সুতরাং অত্যাধুনিক হরমোন চিকিৎসার মাধ্যমে এবং ক্ষেত্রবিশেষ শল্য চিকিৎসার (Surgery) মাধ্যমে এর পুরোপুরি স্থায়ী সমাধান সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞ উলামায়ে কিরামের সুচিন্তিত মতামত, সুশীল সমাজের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, সরকারের সিদ্ধান্ত, প্রশাসনের সদিচ্ছা ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতা।

ইসলামী শরীয়া অনুযায়ী হিজড়াগণ সাধারণ মানুষের মতই তাদের পূর্ণ অধিকার লাভ করবে। লেখা পড়া, শিক্ষা দীক্ষা, চাকরী বাকরী, ব্যবসা বাণিজ্য, উত্তরাধিকার, সম্পদের মালিকানা; ধর্ম-কর্ম, সামাজিক ও উন্নয় কাজের সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রেই তাদের ন্যায্য অধিকার ইসলাম স্বীকার করেছে। কিন্তু আমাদের সমাজে পর্যাপ্ত ইসলামী জ্ঞান না থাকায় এবং নানান কুসংস্কার ও সামাজিক অবক্ষয় ও নৈতিক দৈন্যতার কারণে হিজড়াগণ বঞ্চিত ও অবহেলিত; ক্ষেত্র বিশেষ নিপীড়ন ও নির্যাতনের স্বীকার। তাই ইসলামী বিধান মতে তাদের অধিকার নিশ্চিত করা জরুরী।

মানব সৃষ্টির এ রহস্য সম্পর্কে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বলা হয়েছে– হে মানব মণ্ডলী! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক সত্ত্বা (আদম) হতে; আর তা হতে তৈরি করলেন তার জোড়া (হাওয়া) এবং এতদ্বয় হতে বিস্তৃত করলেন বহু পুরুষ ও নারী। (সূরা-৪ নিসা, আয়াত: ১)। পবিত্র তিনি, যিনি সৃজন করেছেন সকল কিছু জোড়ায় জোড়ায় যা ভূমিতে উৎপন্ন হয় এবং তোমাদের নিজেদের মাঝেও আর তাতেও যা তোমরা জান না। (সূরা-৩৬ ইয়াসীন, আয়াত: ৩৬)। আর যিনি বানিয়েছেন সবকিছু জোড়ায় জোড়ায়। (সূরা-৪৩ যুখরুফ, আয়াত: ১২)। আর নিশ্চয় তিনি সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায় পুরুষ ও নারী। (সূরা-৫৩ নাজম, আয়াত: ৪৫)। হে মানবজাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে। (সূরা-৪৯ হুজুরাত, আয়াত: ১৩)। আর আমি বানিয়েছি তোমাদের জোড়ায় জোড়ায় (পুরুষ ও নারী)। (সূরা-৭৮ নাবা, আয়াত: ৮)। নিশ্চয় আমি ব্যর্থ করি না কোন আমলকারীর কর্ম, হোক সে পুরুষ বা নারী। (সূরা-৩ আলে ইমরান, আয়াত: ১৯৫)। নির্দেশ দিচ্ছেন আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের বিষয়ে, পুত্রের জন্য দুই কন্যার সমান অংশ। (সূরা-৪ নিসা, আয়াত: ১১)। আর যদি হয় তারা বোন ও ভাই, তবে পুরুষের জন্য দুই নারীর সমান অংশ। (সূরা-৪ নিসা, আয়াত: ১৭৬)। যে সৎকর্ম করবে সে পুরুষ বা নারী যদি সে বিশ্বাসী হয়, তবে আমি তাকে উত্তম জীবন দান করব। (সূরা-১৬ নাহল, আয়াত: ৯৭)। আর যে সৎকর্ম করবে সে পুরুষ বা নারী যদি সে বিশ্বাসী হয়, তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সূরা-৪০ মুমিন (গাফির), আয়াত: ৪০)। তোমাদের জন্য কি পুত্র আর তার জন্য কন্যা। (সূরা-৫৩ নাজম, আয়াত: ২১)। আর তিনি সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায় পুরুষ ও নারী। (সূরা-৫৩ নাজম, আয়াত: ৪৫)। অতঃপর তিনি করলেন তা হতে জোড়ায় জোড়ায় পুরুষ ও নারী। (সূরা-৭৫ কিয়ামাহ, আয়াত: ৩৯)। আর যা তিনি সৃষ্টি করেছেন পুরুষ ও নারী। (সূরা-৯২ লাইল,

আয়াত: ৩)। আসমান ও জমিনের রাজত্ব আল্লাহর জন্যই, তিনি যা ইচ্ছা সৃজন করেন; যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা পুরুষ ও নারীতে দম্পতি তৈরি করেন আর যাকে ইচ্ছা নিঃসন্তান রাখেন; নিশ্চয় তিনি মহাজ্ঞানী ক্ষমতাবান। (সূরা-৪২ শুরা, আয়াত: ৪৯-৫০)।

পশু-পাখি ও প্রাণীকুল সৃষ্টির বিষয়েও কুরআন মাজীদে অনুরূপ বলা হয়েছে– অষ্ট জোড়া (সৃষ্টি করলেন), ভেড়ার দুটি (একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী), ছাগলের দুটি (একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী), বলুন- তিনি কি পুরুষ দুটি হারাম করেছেন নাকি স্ত্রী দুটি? নাকি স্ত্রী দুটির গর্ভে যে বাচ্চা রয়েছে তা? তোমরা জ্ঞানত আমাকে বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। এবং উটের দুটি (একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী), গরুর দুটি (একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী); বল, তিনি কি পুরুষ দুটি হারাম করেছেন, নাকি স্ত্রী দুটি? নাকি স্ত্রী দুটির গর্ভে যে বাচ্চা রয়েছে তা! নাকি আল্লাহ যখন এরকম নির্দেশ দিয়ে ছিলেন তখন তোমরা উপস্থিত ছিলে? অতএব যে মানুষকে বিপথগামী করার জন্য না জেনে আল্লাহর নামে

মিথ্যা বানিয়ে বলে তার চেয়ে বড় জালিম আর কে আছে? আল্লাহ জালিমদের হিদায়াত করেন না। (সূরা-৬ আনআম, আয়াত: ১৪৩-১৪৪)। উল্লখ্য যে, আট সংখ্যাটি স্বকীয়মান সংখ্যার বৃহত্তম জোড় সংখ্যা।

কুরআনুল কারীমের উপরোক্ত বর্ণনাসমূহ দ্বারা স্পষ্টতই বুঝা যায় আল্লাহ মানব সমাজকে নারী ও পুরুষ দুভাগে বিভক্ত করেছেন। হাদীস শরীফে এসেছে রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমরা এদের হিজড়া বলো না; এরা নারী বা পুরুষ। যে কারণে ফকীহগণ হিজড়াকে দুভাগে বিভাজিত করেছেন, যথা: নারী হিজড়া ও পুরুষ হিজড়া। অর্থাৎ পুরুষ হিজড়া হলো অপূর্ণ পুরুষ (নারীও নয় এবং নারী পুরুষের মাজামাঝিও নয়); আর নারী হিজড়া হলো অপূর্ণ নারী (পুরুষও নয় এবং পুরুষ ও নারীর মাঝামাঝিও নয়)। এই কারণে নারী হিজড়াগণ পুরুষ সমাজে যাওয়া নিষেধ এবং পুরুষ হিজড়াগণ নারী মহলে প্রবেশ করা নিষেধ রয়েছে। সম্পদের উত্তরাধিকারের বন্টন ও মালিকানা এবং স্বাক্ষ্যের ক্ষেত্রেও হিজড়াকে নারী বা পুরুষ কোন এক শ্রেণীর আওতায় আনতে বলা হয়েছে। ঈমান, ইসলাম, নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত এমনকি বিয়ে-শাদীসহ সকল ইসলামী বিধিবিধান তাদের উপর (নারী ও পুরুষ হিসেবেই) বর্তাবে। অনুরূপভাবে হালাল হারাম, ন্যায় অন্যায় ও জান্নাত জাহান্নামও তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে। এর দ্বারা প্রমাণীত হলো হিজড়া আলাদা কোন সত্ত্বা নয়; এরা নারী বা পুরুষ।

তথ্যসূত্র:

ইমাম আযম (র); ইমাম আবু ইউছুফ (র); ইমাম মুহাম্মাদ (র); আল মাজমূ, ইমাম নববী; আলল ফুরূ, আল্লামা ইবনু মুফলিহ হাম্বলী; ইমাম শাফিয়ী; হাসান ইবনে কাছীর শারহুল কাফী, শামছুল আয়িম্মা ছারাখছী, রদ্দদুল মুহতার দুররুল মুখতার, ইবনু আবিদীন শামী; মানহুল জালীল, আল্লামা অলীশ মালিকী; আত-তাওজীহ, ইবনু কাসিমম; মানারুছ ছাবীল, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৯১, আশ শারহুল মুমাত্তি, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ১৪০ ও ২২৩; খণ্ড: ১২, পৃষ্ঠা: ১৬০, ১৬১; শারহুল মুনতাহা, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৫০; আল ইখতিয়ার, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা: ৩৯; আল মুগনী, খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৬১৯; ফিকাহ বিশ্বকোষ, খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ২০৪, খণ্ড: ২০, পৃষ্ঠা: ২১, ২৩, ২৫; খণ্ড: ৩১, পৃষ্ঠা: ১৬। ফারায়েযে শারীফিয়্যাহ, আবদুন নবী; হাওয়াশী আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ির-ইবনু নুজাঈম, ছায়্যিদ আহমাদ হামুভী; ফাতাওয়া আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌভী, পৃষ্ঠা: ৪০১; সুওয়ালাতে আশারা শাহে বুখারা; ফাতাওয়ায়ে অযীযী, শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিছে দেহলভী, পৃষ্ঠা: ৫৩৯; ফাতাওয়ায়ে রশিদিয়া, রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী, পৃষ্ঠা: ৪৬৫।♦

৬ | দ | ফা | দি | ব | স |

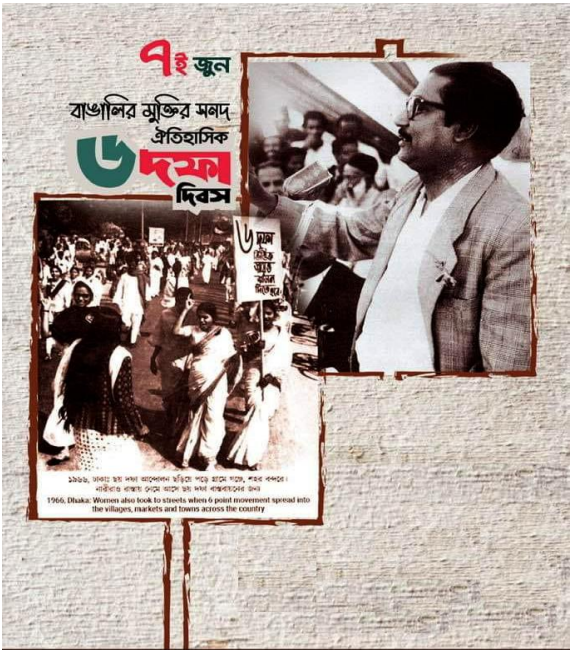

৬ দফা

স্বাধীনতার পথে এক অনন্য দলিল

র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী

স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহে স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাসের তুলনায় এক অসাধারণ অবস্থান নিয়ে আছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসনের জাঁতাকলে নিস্পিষ্ট অন্যান্য দেশের ও জাতির ইতিহাস থেকে ভিন্নতার দাবি রাখে। প্রথমত, একটি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম; দ্বিতীয়ত, ভাষাগত দিক থেকে এক অভিন্ন ভাষাভিত্তিক জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সংগ্রাম; তৃতীয়ত, ভারতীয় উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট বহুজাতিক ভারতীয় জাতীয়তা ও ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানি জাতীয়তার বিপরীতে নৃতাত্ত্বিকভাবে একক জাতিসত্তার স্বতন্ত্র জাতীয়তার বিকাশ; এবং চতুর্থত, গণতান্ত্রিক সংগ্রামের পথ ধরে সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্যদিয়ে অর্জিত স্বাধীনতা অন্যান্য উপনিবেশসমূহের স্বাধীনতা অর্জনের পথ থেকে এক স্বতন্ত্র ও অন্যান্য ইতিহাস রচনা করেছে। শুধু এশিয়া নয়, সমগ্র বিশ্বে উপনিবেশসমূহের স্বাধীনতা অর্জনের পথ প্রায় অভিন্ন। হয় এসকল দেশ সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্যদিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। কিংবা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর দখলদারিত্ব ছেড়ে দিয়ে সাম্রাজ্য গুটিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়ায় কোনো কোনো দেশের স্বাধীনতা দান হিসেবে অর্জিত হয়েছে।

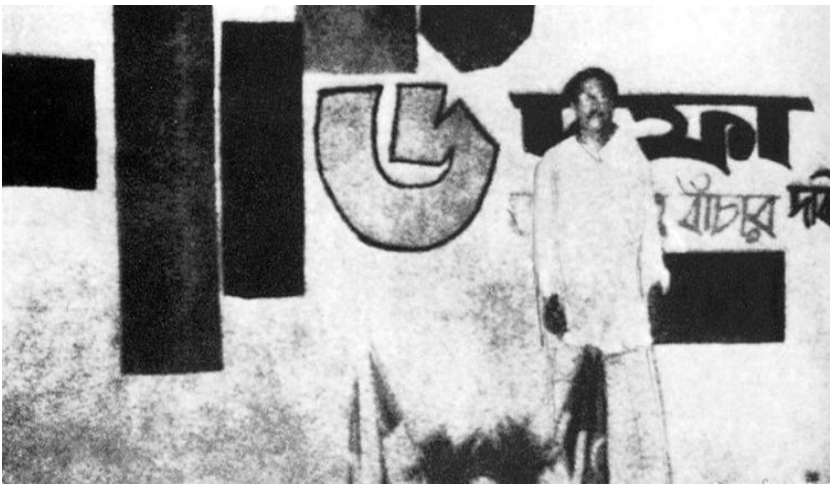

ছয় দফা'র সমর্থনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বক্তব্য রাখছেন

উপনিবেশসমূহের স্বাধীনতা অর্জনের এই তিন পথের বাইরে বাংলাদেশই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা যা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা, গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ও সশস্ত্র যুদ্ধের সমন্বয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। ভারতীয় ও পাকিস্তানি জাতীয়তার বিপরীতে বাঙালির স্বতন্ত্র জাতীয় পরিচয় সংরক্ষণের যে তাগিদ ভাষা-আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি মানসে চেতনার বিকাশ ঘটায় তাই উনিশশো ছেষট্টির ছয়দফা কর্মসূচির মাধ্যমে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের চেতনা বিকাশের পথে এক অসাধারণ

ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসকবর্গ প্রথম থেকেই বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অধিকার হরণ ও নস্যাৎ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র হিসেবে উর্দুকে বাঙালি জনগোষ্ঠীর ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলে ভাষা-আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের সে অপচেষ্টা কিয়দংশে হলেও ব্যর্থ হয়। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সংবিধানে স্বীকৃতি দেয়া হয়। একইভাবে ছাপ্পান্ন সালে গৃহীত শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে আটান্ন পাকিস্তানের প্রথম সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কর্মসূচি গৃহীত হলে প্রথমত, গণতান্ত্রিক সুশীল রাষ্ট্রব্যবস্থা ও পরিণতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার একটা সম্ভাবনার মুখে পাকিস্তানি কায়েমি স্বার্থ সামরিক শাসনের মাধ্যমে তা নস্যাৎ করে দেয়। এইভাবে পাকিস্তানি রাষ্ট্রব্যবস্থায় বাঙালির মর্যাদা ও অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। বাঙালির স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তায় বিশ্বাসী ও বিকাশমান মধ্যবিত্তশ্রেণি পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় থেকে নিজেদের বিকাশের পথ রুদ্ধ হতে দেখে পাকিস্তানের রাষ্ট্রব্যবস্থায় হতাশ হয়ে ওঠে।

উনিশশত বাষট্টিতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও সামরিক স্বৈরশাসক আইয়ুব খান তথাকথিত মৌলিক গণতান্ত্রিকভিত্তিক এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রপতি শাসন সম্বলিত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে বাংলার ওপর চাপিয়ে দিলে বাংলার মানুষের স্বাধীন বিকাশের পথ একবারেই রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। সেই সাথে একটি উচ্ছিষ্টভোগী দাসমনোবৃত্তির মুৎসুদ্দি গোষ্ঠীও গড়ে ওঠার ব্যবস্থা হয় এই স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের আওতায়। তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্রীদের মাধ্যমে একেবারে তৃণমূল পর্যায়েও পাকিস্তান ও এর শাসকগোষ্ঠীর একটি সমর্থক-বলয় গড়ে তোলার পথ করা হয়। পাকিস্তানের কাঠামোর ভেতরে গণতন্ত্রের সংগ্রাম দুষ্কর হয়ে ওঠে। সেইসাথে বাংলার স্বতন্ত্র জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামও জটিলতা ধারণ করে। ১৯৬৫ সালে মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনে পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নাহকে প্রার্থী করে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের এজেন্ডা নিয়ে নির্বাচনি যুদ্ধে ব্যাপক জনসমর্থনের ভিত্তিতে এক অভূতপূর্ব আন্দোলনের সূচনা হয়। কিন্তু ফলাফল প্রত্যাশিতভাবেই সামরিক শাসক আইয়ুবের পক্ষে গেলে গণতান্ত্রিক শিবিরে আবারও হতাশা নেমে আসে। এরই প্রেক্ষাপটে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তানের রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়। যুদ্ধে পরাজয়ের মুখে রাশিয়ার (তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন) রাষ্ট্রপতি পদগর্নি ও প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের আন্তরিক প্রয়াসে তাসখন্দে পাক-ভারত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পশ্চিমপাকিস্তানের সকল মহল

এ শান্তিচুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করলেও বাঙালি স্বার্থের প্রতিভূ শেখ মুজিব ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ শান্তিচুক্তির পক্ষে বক্তব্য রাখেন। মুজিব স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দেন যে, যুদ্ধের সময় পূর্বপাকিস্তান অরক্ষিত ছিল এবং পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এর প্রতিরক্ষার কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি। স্রেফ ভারতের শুভেচ্ছার ওপর এ অঞ্চল যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

পয়ষট্টির অসম পাক-ভারত যুদ্ধের এই ইতিহাসকে বাংলার রাজনীতিকরা বিশেষত বাঙালি স্বার্থের আপসহীন লড়িয়ে শেখ মুজিব কাজে লাগাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন থেকেই পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনের দাবিটি প্রাধান্য পেয়ে আসছিল। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ বিরোধী যুক্তফ্রন্টের প্রধান এজেন্ডাই ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। এজন্য যুক্তফ্রন্ট ২১-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল। ১৯৫৬-এর শাসনতন্ত্রে সীমিত আকারে হলেও স্বায়ত্তশাসনের যে রূপরেখা পাওয়া যায়, ১৯৫৮-এর সামরিক শাসন ও ১৯৬২-এর প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির মৌলিক গণতন্ত্রী শাসনতন্ত্র সে সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দেয়। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রপতির শাসন পূর্বাঞ্চলের বাঙালি জনগোষ্ঠী ও পশ্চিমাঞ্চলের পাখতুন, বালুচ, সিন্ধি প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠীসমূহের সমর্থনলাভে ব্যর্থ হয়। স্বৈরতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতিতে সকল প্রাপ্ত গণতান্ত্রিক সুযোগ কাজে লাগিয়ে অগ্রসরমান গণতান্ত্রিক গোষ্ঠী পাক-ভারত যুদ্ধের পরবর্তীতে তাসখন্দ চুক্তির পটভূমিতে লাহোরে এক কনভেনশনে মিলিত হয় আইয়ুবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পন্থা কী হবে তা নির্ধারণের জন্য। ১৯৬৬-এর ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত এ কনভেনশন যুদ্ধের বাস্তবতার আলোকে এবং বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সমন্বিত করে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কর্মসূচি তুলে ধরার সুযোগ এনে দেয় শেখ মুজিবকে। তিনি এই কনভেনশনে পূর্বপাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের রূপরেখা হিসেবে ৬টি দাবি উত্থাপন করেন, যা ঢাকায় এসে ৬-দফা কর্মসূচি হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

লাহোর কনভেনশনে ৬-দফা ঘোষণার সাথে তা পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থ ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতার বাইরের শক্তির কঠোর সমালোচনার মুখে পড়ে। আইয়ুব থেকে শুরু করে তার পা-চাটা ফকা চৌধুরী, মোনেম খাঁ, সবুর খাঁ, কাজী মাহাবুদ্দিন প্রমুখ পসরকারি নেতা এবং নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান, মমতাজ দৌলতানা, মাহমুদ আলী কাসুরী, জুলফিকার আলী ভুট্টো, মওদুদী ও তার তস্য পদসেবী গো. আযমেরা প্রমুখ বিরোধী বাঙালি-অবাঙালি নেতৃবৃন্দ ৬-দফার বিরোধিতায় মাঠ সরগরম করে তুলল। আইয়ুব বললেন অস্ত্রের ভাষায় ৬-দফার মোকাবেলা করা হবে। বিরোধীরা বললেন যে, এটা বিচ্ছিন্নতার এক নগ্ন দলিল। এমনকি বামনেতা মাওলানা ভাসানীও ৬-দফাকে সিআইএ-এর দক্ষিণ এশিয়

ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে দেখলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে শেখ মুজিব হচ্ছেন মার্কিনী দালাল। সরকারি ও অন্যান্য বিরোধী নেতারা তাকে ভারতীয় দালাল আখ্যা দিলেন। তারা ভিন্ন ভিন্ন প্লাটফরমে থাকলেও ৬-দফার বিরোধিতায় এক সুরে কথা বলতে থাকলেন। কিন্তু কেন এমনটা হল? একমাত্র মস্কোপন্থী ওয়ালি ন্যাপ (পূর্বাঞ্চলে মোজাফ্ফর ন্যাপ) ছাড়া সকলেই ৬-দফা আতঙ্কে ভুগতে লাগলেন। যেন ৬-দফার ভূত তাদের তাড়িয়ে বেড়াতে লাগল। কী ছিল এ ৬-দফায়? কেন ৬-দফা সকলের গাত্রদাহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল?

১৯৬৫-এর ৫ ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত কনভেনশনে শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে নিম্নবর্ণিত ৬টি প্রস্তাব উত্থাপন করেন :

প্রস্তাব নং-১ : শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি

দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো এমন হতে হবে যেখানে পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশনভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ এবং তার ভিত্তি হবে লাহোর-প্রস্তাব। সরকার হবে সংসদীয় পদ্ধতির। সার্বজনীয় ভোটে নির্বাচিত পার্লামেন্ট হবে সার্বভৌম।

প্রস্তাব নং-২ : শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি

কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কেবলমাত্র দুটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে, যথা দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে ফেডারেটিং রাষ্ট্রসমূহের ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ।

প্রস্তাব নং-৩ : মুদ্রা বা অর্থ সম্পর্কীয় ক্ষমতা

মুদ্রার ব্যাপারে নিম্নলিখিত দুটির যে কোনো একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা যেতে পারে-

ক. সমগ্র দেশের জন্য দুটি পৃথক অথচ অবাধ বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে; অথবা,

খ. সমগ্র দেশের জন্য কেবল একটি মুদ্রা চালু থাকতে পারে এ শর্তাধীনে যে, শাসনতন্ত্রে ব্যবস্থা থাকতে হবে যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থ পাচার বন্ধ থাকবে।

এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানে পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভের ব্যবস্থা করতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতির প্রবর্তন করতে হবে।

প্রস্তাব নং-৪ : রাজস্ব, কর বা শুল্ক-সম্বন্ধীয় ক্ষমতা

ফেডারেশনের অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর কর বা শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো প্রকার কর বা শুল্ক ধার্যের ক্ষমতা থাকবে না। তার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য ফেডারেটিং রাষ্ট্রের রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে। ফেডারেটিং রাষ্ট্রগুলোর সকল করের শতকরা একই হারে আদায়কৃত অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল গঠিত হবে।

প্রস্তাব নং-৫ : বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা

ক. ফেডারেটিং রাষ্ট্রসমূহের বহির্বাণিজ্যের হিসাব পৃথকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

খ. বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ফেডারেটিং রাষ্ট্রগুলোর এখতিয়ারাধীন থাকবে।

গ. কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অথবা সর্বসম্মত কোনো হারে ফেডারেটিং রাষ্ট্র মেটাবে।

ঘ. ফেডারেটিং রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দেশজ দ্রব্যাদির চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা কর জাতীয় কোনো বাধানিষেধ থাকবে না; বরং

ঙ. শাসনতন্ত্র ফেডারেটিং রাষ্ট্রগুলোকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্ব-স্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে।

প্রস্তাব নং-৬ : আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা

আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে ফেডারেটিং রাষ্ট্রগুলোকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা-সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।

৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬-তে ঢাকার সংবাদসপত্রসহ গুরুত্ব দিয়ে ৬-দফার কথা প্রকাশ করে। ২১ ফেব্রুয়ারিতে সর্বপ্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬-দফার বিশ্লেষণ-সম্বলিত পুস্তিকাটি বিতরণ করা হয়। আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতাদের একাংশ

৬-দফা প্রশ্নে দ্বিমত পোষণ করলেও একই বছরের ১৩ মার্চ অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় প্রস্তাবসমূহ একটি সুসংসবদ্ধ কর্মসূচি হিসেবে কাউন্সিলে অনুমোদন সাপেক্ষে অনুমোদন করে। ১৮, ১৯ ও ২০ মার্চ হোটেল ইডেনে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে ৬-দফা কর্মসূচি অনুমোদন লাভ করে। শেখ মুজিব কর্তৃক সারাদেশে ৬-দফাকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য শেখ সাহেব তাঁর তরুণ ও তেজস্বী সহকর্মীদের নিয়ে এক ব্যাপক কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

৬-দফা আন্দোলন নিয়ে ইতোমধ্যে বাংলাদেশে বহু লেখালেখি হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও প্রচুর লেখালেখি ও গবেষণাকর্ম হতে থাকবে। আমাদের বর্তমান লেখনীটি একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করছি এ প্রত্যাশায় যে, ভবিষ্যতে গবেষকদের জন্য হয়তোবা নতুন কোনো দিকের সন্ধান দিতে পারে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ এই সময়কালব্যাপী বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ের সংগ্রাম থেকে বাঙালি জাতিসত্তার স্বতন্ত্র পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকার যে স্বজাত্যবোধ জাগ্রত হয়, ৬-দফা কর্মসূচি প্রদানের পর বাঙালির সে স্বজাত্যবোধ ভারতীয় ও পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের বিপরীতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সূচনা করে। বস্তুত ৬-দফার ব্যাখ্যায় এর প্রণেতারা, বিশেষত শেখ মুজিব যা কিছুই বলুন না কেন, আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচার-প্রচারণায় কার্যত ৬-দফা কর্মসূচি বাঙালির মুক্তিসনদরূপে আখ্যায়িত হতে থাকে। এভাবে ৬-দফাকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এক স্বতন্ত্র স্বাধীন বাঙালি আবাসভূমির আকাঙ্ক্ষার রূপ নিতে থাকে।

প্রথম থেকেই সাধারণ্যে না আসলেও ৬-দফা যে ১-দফার পথে যাত্রার প্রথম পদক্ষেপ তা ৬-দফাপন্থীদের মাঝে ব্যাপকভাবে আলোচিত হতে থাকে। এজন্যই দেখা যায়, পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে যারা সম্ভব মনে করেছিলেন, আওয়ামী লীগের সেইসব নেতা আব্দুস সালাম খান, মাওলানা তর্কবাগীশ (পরবর্তী সময় মূল দলে ফিরে আসেন ৭০-এর নির্বাচনের পূর্বেই), আবুল মনসুর আহমেদ, যশোরের মশিউরি রহমান (পরবর্তী সময় মূল আওয়ামী লীগে ফিরে আসেন ও '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রতিরোধের সময় যশোরে শহীদ হন পাকিস্তানিদের হাতে), রংপুরের মতিউর রহমান (পরবর্তী সময় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি, সত্তরের নির্বাচনের পূর্বে মূল দলে ফিরে আসেন ও স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী হন), বগুড়া ও রাজশাহীর মুজিবুর রহমান প্রমুখ ৬-দফা প্রশ্নে ভিন্নমত পোষণ করে স্বতন্ত্র ৮-দফাপন্থী বা পিডি এম-পন্থী আওয়ামী লীগ ত্যাগ করেন। এদিকে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, মিজানুর রহমান

চৌধুরী, এম. এ. আজিজ, জহুর আহমেদ চৌধুরী, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী, মোল্লা জালালউদ্দিন আহমেদ, আব্দুল মোমেন, মালেক উকিল প্রমুখ শেখ সাহেবের পাশে থেকে ৬-দফার সংগ্রাম তথা বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে বেগবান করার দায়িত্ব নিলেন। তাঁদের সাথে যুক্ত হলেন শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক প্রমুখ। তাদের নেতৃত্বে সারাদেশের ছাত্র-যুবকরা বাঙালির স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৬-দফা আন্দোলনকে একটি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারর জন্য কাজ করে যেতে থাকলেন। ৬-দফা যে কার্যত ১-দফা বা স্বাধীনতারই প্রাথমিক পদক্ষেপ- এ কথা, এ প্রচার ক্রমান্বয়ে তীব্রতা লাভ করতে লাগল। জনগণের কাছে, বিশেষত বুদ্ধিজীবী মহলের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ৬-দফার একটি দফাও পাকিস্তানের কাঠামোতে স্থান পাওয়ার উপযুক্ত নয়।

লাহোর-প্রস্তাবের আলোকে ফেডারেশন গড়ার অর্থই হচ্ছে দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংঘ প্রতিষ্ঠা করা। এ ধরনের ফেডারেশন তত্ত্বে থাকলেও বাস্তবে কোথাও এর অস্তিত্ব নেই। কেন্দ্রের বা ফেডারেল সরকারের হাতে দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রেখে তাকে করারোপের অধিকার বঞ্চিত রাখার যে প্রস্তাব; তা ফেডারেল সরকার নয়, ফেডারেটিং স্টেটের সার্বভৌমত্বের খোলাখুলি স্বীকৃত এবং ফেডারেল সরকারের যুদ্ধব্যবস্থাকে ফেডারেটিং স্টেটের সদিচ্ছার ওপর ছেড়ে দিয়ে স্টেট কর্তৃক আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠনের প্রস্তাব আর যাইহোক একই ছাদের নিচে বসবাসের কোনো উদ্যোগ নয়। এই কথা যারা ৬-দফা কর্মসূচি নিয়ে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম রচনা করছিলেন তারা যেমন জানতেন, জানতেন তারাও যারা এর বিরোধিতা করছিলেন। বর্ণবৈষম্য উচ্ছেদ করে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার পথ করা যে বাস্তবে দক্ষিণ আফ্রিকায় সাদাবর্ণদের আধিপত্যের চির-অবসান ও কৃষ্ণাঙ্গ-শাসন প্রতিষ্ঠার নামান্তর মাত্র একথা বর্ণবাদবিরোধী ও বর্ণবাদের পক্ষে শক্তি উভয়েই ভালোভাবে জানতেন। তেমনি ৬-দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর রূপান্তর যে বাস্তবে পাকিস্তানি শাসনের অবসান- একথা পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ ও ৬-দফার প্রবক্তা শেখ মুজিব ও তার তরুণ সঙ্গী সকরেই ভালোভাবে জানতেন। তাই পাকিস্তানিরা তাঁকে জীবনের মতো নিশ্চিহ্ন করে দিতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আশ্রয় নেয় আর মুজিব পথ নেন আপসহীন সংগ্রামের, যা শেষ পর্যন্ত একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সমাপ্তি লাভ করে। শেখ মুজিব ও ৬-দফাপন্থীদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার পাকিস্তানি ষড়যন্ত্রের ব্যর্থতাই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানের পথকে সুগম করে দেয়।

বস্তুত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাধারণ সূত্র অনুযায়ী ৬-দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে পাকিস্তানে ফেডারেল রাষ্ট্র গঠন কোনো অবাস্তব বা অস্বাভাবিক প্রস্তাব না হলেও কোনো ফেডারেল রাষ্ট্রের গঠনই ৬-দফানুগ নয়। ষাটের দশকে এ ধরনের ফেডারেল রাষ্ট্র গঠনের কয়েকটি প্রচেষ্টাই মধ্যপ্রাচ্যে ভেস্তে যায়। প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুল নাসের, হাফেজ আল আসাদ ও মোয়াম্মের গাদ্দাফীর এ ধরনের ফেডারেশন গঠন প্রক্রিয়া বারবারই ব্যর্থ হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র বা যুগোস্লোভিয়ায় ফেডারেল রাষ্ট্র কাঠামো থাকলেও একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অন্য দুটি ফেডারেশন যে ক্ষণভঙ্গুর ছিল তা ইতিহাসের শিক্ষায় আজ প্রমাণিত। মার্কিনিদের রয়েছে এক ভাষা ও সংস্কৃতি, ধর্মবোধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য। দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে তারা একটি কার্যকর গণতন্ত্রও স্থাপন করতে সক্ষম হয়। তাই তাদের ফেডারেল শাসন ফেডারেটিং রাষ্ট্রসমূহকে বিচ্ছিন্নতার অধিকার দিলেও কার্যত তা তত্ত্বকথায়ই থেকে যায়। দাসপ্রথার বিরুদ্ধে উত্তর দক্ষিণের বিরোধ যে অন্তঃরাষ্ট্র যুদ্ধের বা সিভিল ওয়্যারের সূচনা করেছিল তাও ফেডারেল রাষ্ট্রকাঠামোর ভেতরে একত্রে বসবাসের অঙ্গীকারকে চ্যালেঞ্জ করেনি। স্বাধীনতাযুদ্ধের সাধারণ ঐতিহ্য, ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি মার্কিন ফেডারেশনকে এক থাকতেও একটি সাধারণতন্ত্র ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় চালিকাশক্তি হয়ে থেকেছে ও আছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুগোস্লাভিয়া ভেঙে গিয়ে ভাষাভিত্তিক, জাতিগোষ্ঠীভিত্তিক ও ধর্মভিত্তিক বৃহৎ ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। ভারতীয় ফেডারেশন যে এখনও এক আছে তার প্রধান কারণ হচ্ছে দুটি। প্রথমত, ভারতবর্ষ বহুজাতিক বহুভাষিক দেশ হলেও তার রয়েছে কয়েক হাজার বছরের পুরনো অভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং দ্বিতীয়ত, ইতোমধ্যে ভারতীয়রা ত্রুটিপূর্ণ হলেও একটি কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। অবশ্য স্বাধীনতার সংগ্রাম গঠনেও তাদের রয়েছে এক সাধারণ ঐতিহ্য। ভারতীয়দের উদাহরণ নিয়েই আজকের ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠনের নানা প্রক্রিয়া ও পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে।

সুতরাং পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, ৬-দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে প্রস্তাবিত পাকিস্তান ফেডারেশন বাস্তবে শান্তিপূর্ণ পথে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের বৈ আর কিছু নয়। পাকিস্তানিদের সাথে এক ছাদের নিচে বসবাস করা যে বাঙালির পক্ষে অসম্ভব ও অপ্রয়োজনীয়- একথা ষাটের দশকে বাঙালি স্বার্থের একক মুখপাত্র হিসেবে দাঁড়ানো শেখ মুজিব জানতেন ও বুঝতেন। তাঁর এই রাজনৈতিক দর্শনকে বাঙালির স্বাধীনতার লক্ষ্যে পরিচালিত করার জন্যই

তিনি ৬-দফা কর্মসূচি উত্থাপন করেছিলেন। গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মাধ্যমে জনগণের মানস গঠনের কাজে ব্যবহার করা হয় ৬-দফাকে। এ কারণেই আগরতলা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে শেখ মুজিব পাকিস্তান ভেঙে দিতে প্রয়াসী হয়েছেন- এতবড় অভিযোগও জনগণের মাঝে হালে পানি পায়নি। জনগণ মুজিবের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথে আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়। দ্বিতীয় দফায় সামরিক শাসন অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কারণে আপোষের পথে অগ্রসর হয় এবং এলএফও দিয়ে নির্বাচনের ব্যবস্থা করলে বঙ্গবন্ধু ও তার ৬-দফার ভিত্তিতে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে নেন। একই সাথে তিনি উনসত্তরের ৫ ডিসেম্বর পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলকে 'বাংলাদেশ' নামকরণ করে স্বাধীন বাংলাদেশের পথ জনগণের মানস গঠনকেও আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যান, যা পরবর্তী সময় বাংলাদেশ প্রশ্নের সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নিতে জনগণকে আর দ্বিধান্বিত করেনি। একাত্তরের ৭ মার্চের পর বাংলাদেশ ডি-ফ্যাক্টো স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ও সরকার গঠনে তাই আর শেখ মুজিবকে বেশি বেগ পেতে হয়নি।

অতএব, আমাদের আলোচনার সারমর্ম আমরা এভাবে টানতে পারি যে, সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পথে দফা কর্মসূচি এক মূল্যবান অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে। ৬-দফার প্রণেতা ও উপস্থাপক শেখ মুজিব ও তাঁর তরুণ অনুসারীরা (প্রায় সকল আওয়ামী লীগ নেতার বয়সই পঞ্চাশের নীচে ছিল শেখ মুজিব যখন ৬-দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করেন তখন তিনি ৪৬ বছরের এক টগবগে যুব পুরুষ) একথা ভালোভাবেই জানতেন যে, ৬-দফার ভিত্তিতে পাকিস্তান ফেডারেশন একটি অসম্ভব ও অগ্রহণযোগ্য প্রস্তাব। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী কোনোদিনই এটি মেনে নেবে না বা মেনে নিতে পারে না। ৬-দফাভিত্তিক ফেডারেশন মানেই হচ্ছে শান্তিপূর্ণভাবে পাকিস্তানের বিভাজন ও এক-পাকিস্তানের মৃত্যু। ৬-দফার কোনো একটি দফাও পাকিস্তানের ঐক্যের পক্ষে নয়। বরং প্রতিটি দফাই বাঙালির স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ও অবশ্যম্ভাবিতাকে তুলে ধরে। তাই পাকিস্তানিরা ৬-দফাকে বিচ্ছিন্নভাবে দলিল বললেও আমরা বলব ৬-দফা ছিল বাঙালির ম্যাগনাকার্টা ও স্বাধীনতা অর্জনের পথে এক প্রামাণ্য দলিল ও অনুঘটক।♦

লেখক : পঁচাত্তর পরবর্তী প্রতিরোধ যোদ্ধা, সংসদ সদস্য এবং সম্পাদক, মত ও পথ।

ছয় দফা সম্পর্কে আদালত

বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে শোষিত-বঞ্চিত-নিষ্পেষিত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর এক সম্মেলনে আওয়ামী লীগের পক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (তখনো 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হননি) ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন। ৫ ফেব্রুয়ারি এই দাবিসমূহ উত্থাপন করা হলে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী ও তাদের অনুসারীরা বঙ্গবন্ধুকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিত্রিত করার অপচেষ্টা চালান। বঙ্গবন্ধু ঐ সম্মেলন বর্জন করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ৬ দফা প্রস্তাব অনুমোদিত এবং দাবিসমূহ আদায়ের লক্ষ্যে

আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে ১৯৬৬ সালে ১৮ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের নামে 'আমাদের বাঁচার দাবি : ৬ দফা কর্মসূচী' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রচার করা হয়। খুব দ্রুতই ৬ দফা দাবি বাঙালির প্রাণের দাবি তথা 'স্বাধীনতা ও মুক্তির সনদে' পরিণত হয়। সূচিত হয় তীব্র ছাত্র-গণআন্দোলন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে জেল-জুলুম, নির্যাতন, দমন-পীড়নের পথ বেছে নেয়। বঙ্গবন্ধুসহ আওয়ামী লীগের শত শত নেতাকর্মী, ছাত্র-শ্রমিক-যুবককে গ্রেফতার করে বেআইনিভাবে কারারুদ্ধ করা হয়।

৬ দফা দাবির আন্দোলনকে দমন ও নস্যাৎ করার অভিপ্রায়ে শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালা, ১৯৬৫-এর বিধি ৩২ বলে ৮-০৫-১৯৬৬ ইং তারিখে নির্যাতনমূলক আটকাদেশ প্রদান করে। পরে ২৯-০৫-১৯৬৭ তারিখে পুনরায় আরো একটি আটকাদেশ জারি করা হয়। তৎকালীন ঢাকা হাইকোর্টে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে উভয় আটকাদেশ চ্যালেঞ্জ করেন রেজাউল মালিক। উভয় মামলা একত্রে শুনানি হয়। বিচারপতি বাকের, বিচারপতি আবদুল্লাহ ও বিচারপতি আবদুল হাকিমের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে উভয় মামলা একত্রে শুনানি এবং পরে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে পুনঃশুনানি হয়। বিচারপতি বাকের ও বিচারপতি আবদুল হাকিম রুল দুটি খারিজ করে আটকাদেশ বহাল রাখেন। বিচারপতি আবদুল্লাহ তাদের সঙ্গে ভিন্নমত প্রকাশ করে আটকাদেশ বেআইনি ঘোষণা করেন। বিচারপতি আবদুল্লাহ তার রায়ে সৈয়দ ফজলুল হক বনাম সরকার মামলায় (বিবিধ মামলা নং-৯৫/১৯৬৬) প্রদত্ত রায় উল্লেখ করে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, 'উপরোক্ত মামলায় ৬ দফা কর্মসূচির বিচারিক মীমাংসা করা হয়েছে। বিচারপতি বাকের ও বিচারপতি আবদুল হাকিম ঐ মামলায় অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ৬ দফা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করায় কোনো অপরাধ হয়নি।'

ঐ মামলা উদ্ভব হয়েছিল আওয়ামী লীগের নেতা আবদুল আজিজের আটকাদেশ চ্যালেঞ্জ করায়। আবদুল আজিজকে আটকের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, 'জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংকীর্ণ মনোভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরিচালিত ক্ষতিকারক ৬ দফা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য আটক করা হয়েছে। আটককৃতের কর্মকাণ্ড জননিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, দেশে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা সরবরাহ রাখার জন্য ক্ষতিকর।'

উপরিউক্ত রায়ের ভিত্তিতে বিচারপতি আবদুল্লাহ অভিমত দেন যে, 'আমার বিজ্ঞ ভ্রাতৃদ্বয় (বিচারকবৃন্দ) জনাব আবদুস সালাম খানের (আইনজীবী) এই যুক্তি গ্রহণ করেছেন যে, সুপ্রিম কোর্ট কিংবা হাইকোর্ট– কোনো আদালতই

কখনো ৬ দফা কর্মসূচিকে ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড বলে বর্ণনা করেনি এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে '৬ দফা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকে ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড' হিসেবে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে আটককারী কর্তৃপক্ষ সঠিক ছিল না। আমার বিজ্ঞ ভ্রাতৃদ্বয় '৬ দফা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকে ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড' হিসেবে বিবেচনা করেন না এবং তারা এই সিদ্ধান্ত পর্যন্ত দিয়েছেন যে, কেবল ৬ দফা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করাই আটকের জন্য যথেষ্ট– আটককারী কর্তৃপক্ষ এরকম একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। শেষ পর্যন্ত সেই মামলায় বিজ্ঞ ভ্রাতৃদ্বয় রুল চূড়ান্ত (অ্যাবসলিউট) করেন।'

বিচারপতি আবদুল্লাহ আরো অভিমত দেন যে, আওয়ামী লীগ দেশে ক্রিয়াশীল একটি রাজনৈতিক দল। তারা ৬ দফা কর্মসূচিকে নিজেদের প্ল্যাটফরম হিসেবে গ্রহণ করেছে। ৬ দফা কর্মসূচির মূল কথা হলো ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পাকিস্তানের উভয় অংশের জন্য সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেওয়া। স্বীকৃত মতেই সরকার কর্তৃক ৬ দফা কর্মসূচি বা দলের কর্মকাণ্ডকে পলিটিক্যাল পার্টিজ অ্যাক্টের ৬ ধারা অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের কাছে রেফার করার কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আটককৃত যিনি এই দলের সভাপতি (বঙ্গবন্ধু), তিনি ছয় দফা কর্মসূচিকে জনগণের সামনে তুলে ধরতে গিয়ে ক্ষতিকারক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছেন– এটা বলা যাবে না। সরকারের পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, এসব বক্তৃতা সংকীর্ণতা সৃষ্টি করছে। আটককৃত পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছেন, যাতে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের হস্তক্ষেপ ছাড়া নিজের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারে। দাবি করা হয়, এভাবে আটককৃত পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতার পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছেন, যা পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্ট করবে। আমি বক্তৃতাগুলো মনোযোগ সহকারে পড়েছি এবং এরকম কোনো ইঙ্গিত খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছি। প্রতীয়মান হয় যে, এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানের বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহও ৬ দফা কর্মসূচি প্রত্যাখ্যান করায় আটককৃত ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং সে কারণে পশ্চিম পাকিস্তানি ভ্রাতাদের পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কথিত যে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে, সে ব্যাপারে উপলব্ধি করানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি (বঙ্গবন্ধু) আরো উল্লেখ করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ছাড় দেওয়ার মাধ্যমে জাতীয় পরিষদে প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সমতার নীতি থেকে সরে এসেছে। পূর্ব পাকিস্তান কর্তৃক পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষে ছাড় দেওয়ার আরো কিছু নজির তুলে ধরেন। তিনি যুক্তি দেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের উচিত প্রতিদান দেওয়া। তিনি পাকিস্তানের দুই অংশের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে প্রচারণা চালান এবং গত

সেপ্টেম্বরের যুদ্ধের অভিজ্ঞতার কারণে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের অতিপ্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দেন। পুরো বক্তৃতার সারমর্ম ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি বা সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা বা বিদ্বেষ ছড়ানো নয়, বরং সর্বশেষ যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অতিপ্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরা। এটা সত্য যে, ভাষা প্রায়শই জোরালো, তবে কোনো একটি উদ্দেশ্যের প্রচারমূলক যে কোনো রাজনৈতিক বক্তৃতায় যা হয় তার বেশি নয়। আমরা বক্তব্যগুলোর বিষয়ে বিস্তারিত যেতে চাই না, তবে এগুলোর ব্যাপারে সরকারের ব্যাখ্যা যৌক্তিক নয়; এবং এটা এই দাবিকেই সমর্থন করে যে, সরকার বক্তব্যগুলোকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছে, যা ইঙ্গিত করে যে, সরকারের উদ্দেশ্য হলো পলিটিক্যাল পার্টিজ অ্যাক্টের অধীনে ব্যবস্থা না নিয়ে ৬ দফা কর্মসূচিকে বন্ধ করে দেওয়া।'

বঙ্গবন্ধুকে আটকাদেশ দেওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় যে, তিনি ২০-০৩-১৯৬৬ ইং তারিখে ঢাকা স্টেডিয়ামের জনসভায় ৬ দফা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ক্ষতিকর বক্তব্য তথা সরকারের সমালোচনা করে পাকিস্তানের নাগরিকদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বৈরিতা ও ঘৃণার মনোভাব জাগাতে এবং জনগণের মধ্যে ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে বিচারপতি আবদুল্লাহর পর্যবেক্ষণ হলো, 'আটককৃত (বঙ্গবন্ধু) পাকিস্তানের নাগরিকদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বৈরিতা ও ঘৃণার মনোভাব জাগিয়ে তোলা এবং জনগণের মধ্যে ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করতে চেয়েছেন– এটা আটককারী কর্তৃপক্ষের অনুমানমাত্র। বক্তৃতায় ৬ দফা দাবির ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং জনগণের মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধীকারের কথিত লঙ্ঘনের জন্য বর্তমান সরকারের সমালোচনা করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখান থেকে তারা এই অনুমান করেছেন। যদি তা-ই হয়, তাহলে শুধু একটি বক্তৃতা দ্বারা কোনো যুক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি এই মর্মে সন্তুষ্ট হতে পারেন না যে, আটককৃত কোনো ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড করতে উদ্যত হয়েছেন কিংবা করার সম্ভাবনা রয়েছে।'

বিচারপতি আবদুল্লাহ পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনার আলোকে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালা ১৯৬৫-এর বিধি ৩২-এর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুকে প্রদত্ত আটকাদেশের কারণসমূহ পর্যালোচনা করে অভিমত দেন যে, 'অবৈধভাবে জারিকৃত আটকাদেশসমূহ পাকিস্তান প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ বা বিধিমালার অধীনে জারি হয়েছে বলে ধরে নেওয়া সঠিক হবে না। তিনি রুল দুটি চূড়ান্ত করে আটককৃত বঙ্গবন্ধুকে মুক্তির নির্দেশ দেন। (১৯ ডিএলআর, পৃষ্ঠা-৮২৯)

ছয় দফা নিয়ে প্রকাশিত পুস্তিকার প্রচ্ছদ

২০-০৩-১৯৬৬ ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু ৬ দফা দাবির সমর্থনে আউটার স্টেডিয়ামে, যা সাধারণভাবে পল্টন ময়দান হিসেবে পরিচিত, জনসভায় যে বক্তব্য দিয়েছিলেন তার কারণে তাঁকে আটকাদেশ দেওয়ার পাশাপাশি পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার বিধি ৪১ ও ৪৭-এর বিভিন্ন উপবিধি ভঙ্গের অভিযোগে ঢাকার প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচারের সম্মুখীন করা হয়। বিচারে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট বিধি ৪৭(৫) ও ৪১(৬)-এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত করে ১৫ মাসের বিনাশ্রম সাজা প্রদান করেন। আপিলে আদালত সাজা কমিয়ে আট মাস করে। পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু হাইকোর্টে রিভিশন দায়ের করেন। বিচারপতি আবদুল হাকিম রিভিশন শুনানি অন্তে রুল চূড়ান্ত করে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বঙ্গবন্ধুকে প্রদত্ত দোষী সাব্যস্ত করার রায় ও আদেশ বাতিল করে খালাস প্রদান করেন।

বিচারপতি আবদুল হাকিম তার রায়ে ৬ দফা ও তার সমর্থনে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা প্রসঙ্গে অভিমত দিয়েছেন যে, 'দরখাস্তকারীর বক্তৃতা এই প্রেক্ষাপটেই বিবেচনা করতে হবে যে, বক্তা একটি রাজনৈতিক দল, অর্থাৎ আওয়ামী লীগের সভাপতি। দলটির ৬ দফা কর্মসূচি সরকার নিষিদ্ধ করেনি কিংবা তা অবৈধ ঘোষণা করা হয়নি। একটি দলের সভাপতি হিসেবে বক্তা তার কর্মসূচি নিয়ে অগ্রসর হওয়া এবং তার মতামত প্রচার করার অধিকার রাখেন। সাংবিধানিক বিধিবিধান বিবেচনা করলে ৬ দফা কর্মসূচির সমর্থনে কথা বলা এবং দেশের কল্যাণের জন্য সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের সমালোচনা করার অধিকার তার রয়েছে। এই মামলায় বক্তা ১৯৬৬ সালের ২০ মার্চ ঢাকার পল্টন ময়দানের

একটি জনসভায় বক্তৃতা করেছেন এবং সংসদীয় পদ্ধতির সরকার পুনঃপ্রবর্তন, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ, কেন্দ্রীয় রাজস্ব প্রদেশগুলোতে বিতরণ, প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের আত্মনির্ভরশীলতা ইত্যাদি দাবি জানিয়েছেন। তার জোরালো বক্তৃতায় তিনি অন্যান্য বিষয়েও কথা বলেছেন এবং সরকারের বিভিন্ন নীতির সমালোচনা করেছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েক জন রাজনৈতিক নেতার সমালোচনাও করেছেন এবং কিছু বড় ব্যবসায়ীর নিন্দা করেছেন। নিঃসন্দেহে বক্তা ৬ দফা কর্মসূচি সম্বন্ধে শ্রোতাদের মনে দাগ কাটার জন্য এবং সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের সমালোচনার ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও উদ্ধত শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি বেশ কিছু সহিংস শব্দও উচ্চারণ করেছেন এবং মনে হয় উত্তেজনার এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন যে কোথাও কোথাও তার বক্তব্যের খেই রাখা কঠিন হয়ে পড়েছিল।... কিন্তু একটা বিষয় পরিষ্কার যে, এই বক্তৃতায় এমন কিছু বিষয় উঠে এসেছে, যা তেতো লাগলেও তথ্যগতভাবে সঠিক এবং তা অপ্রীতিকর সত্য।'

বিচারপতি হাকিম আরো অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, 'বক্তা সরকারের বিভিন্ন নীতিমালা সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন, যা করার অধিকার তাঁর রয়েছে। কোথাও কোথাও তাঁর জ্বালাময়ী বিস্ফোরক মন্তব্য অস্বস্তিকর হতে পারে, কিন্তু তা ৪১(৬) বিধির অধীনে কোনো ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড সংঘটন করে না। ... বক্তৃতাটি যেহেতু সরকারের প্রতি অসন্তোষ সৃষ্টি করা বা জনগণের মধ্যে ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি এবং দেশে কোনো আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গকারী পরিস্থিতি সৃষ্টি করা ছাড়াই দলের প্রস্তাবিত ৬ দফা কর্মসূচি প্রচারের লক্ষ্যে করা হয়েছে, ফলে এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, আবেদনকারী (বঙ্গবন্ধু) ক্ষতিকর কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছেন।' (২১ ডিএলআর, পৃষ্ঠা-৮১০)

৬ দফা সম্পর্কে তৎকালীন ঢাকা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিগণের অভিমত ও পর্যবেক্ষণ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, ৬ দফা দাবি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনগণের অধিকার আদায় ও বৈষম্য দূরীকরণের ন্যায়সংগত ও যৌক্তিক দাবি। 'শেখ মুজিব বিচ্ছিন্নতার আন্দোলন শুরু করেছে'– পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও তাদের সহযোগী রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও আমলাদের এ অভিযোগ ছিল অসার ও ভিত্তিহীন।♦

লেখক : বিচারপতি, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ এবং সাবেক চেয়ারম্যান, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১, বাংলাদেশ

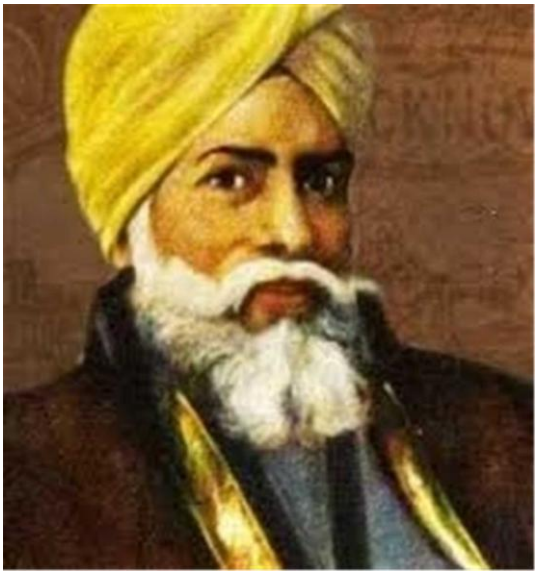

অবিভক্ত ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগ্রামী নেতা

মৌলভী আহমদউল্লাহ শাহ

(১৭৮৭-১৮৫৮)

কাজী আখতারউদ্দিন

ভারত যখন ৭২ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন আমরা স্মরণ করি এক বিখ্যাত স্বাধীনতা যোদ্ধা, মৌলভী আহমদউল্লাহ

শাহকে, যিনি কেবল ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে নেতৃত্বেই দেননি, বরং নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে জাতির জন্য চূড়ান্ত আত্মত্যাগ করেছিলেন। তাঁর মাথা এবং দেহ উত্তর প্রদেশের শাহজাহানপুরের ভিন্ন ভিন্ন দুটি জায়গায় সমাহিত রয়েছে. . .

১৪ আগস্ট ২০১৯ সালের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের প্রাক্কালে, *উলেমা'স রোল ইন ইন্ডিয়া'স ফ্রিডম মুভমেন্ট* বইটির লেখক ও সাংবাদিক সৈয়দ উবায়দুর রহমান (Sify.com) কথাগুলো এভাবে বলেছেন।

১৮৫৭ সালের যুদ্ধে মৌলভী আহমদ উল্লাহ শাহের সুযোগ্য নেতৃত্বের কারণেই বিদ্রোহী সিপাহিরা লখনউ, শাহজাহানপুর, বেরিলি এবং অযোধ্যায় সাফল্য অর্জন করেছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনার বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন অন্যতম সফল একজন সেনাপতি। একজন প্রশিক্ষিত সৈনিক না হওয়া সত্ত্বেও মৌলভী আহমদউল্লাহ শাহ উত্তর ভারতের কানপুর থেকে লখনউ, দিল্লি, বেরিলি এবং শাহজাহানপুর পর্যন্ত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। লখনউ এবং এর আশেপাশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাদলের পরাজয়ের পেছনে তাঁরই কৃতিত্ব ছিল। তাঁর বীরত্ব, লড়াকু মনোভাব এবং নেতৃত্বের দক্ষতার কারণে তিনি একজন কিংবদন্তি হয়ে হয়েছেন। বার বার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেও তিনি হার মানেন নি, কেবল বন্ধুর বেশে একজন শত্রু তাঁকে শহিদ বানিয়েছে। তাঁর অদম্য সাহস, পরাক্রম এবং লড়াকু মনোভাবের কারণে এমনকি তাঁর ঘোরতর শত্রুও তাঁর প্রশংসা করে তাঁকে একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক এবং কিংবদন্তি সামরিক নেতা বলতেন।

১৭৮৭ সালে তাঁর মাদ্রাজে জন্ম হয় এবং তখন তাঁর নাম ছিল সিকান্দার শাহ। অত্যন্ত অল্পবয়সেই তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে উঠেন। তাঁর শৈশবের জীবন সম্পর্কে তেমন কিছু জানা না গেলেও, এই বিদ্বান সেনাপতির তরুণ বয়সে মাদ্রাজ এবং এরপর নিজামের হায়দরাবাদের কিছু বিবরণ জানা যায়। কথিত আছে নিজামের একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ার সাথে বিয়ে হওয়ার কথা থাকলেও, কোন কারণে তা আর বাস্তবায়িত হয়নি। জানা যায় গ্রেট ব্রিটেন সফর করে সেখানে তিনি রানির সাথেও দেখা করেছিলেন। ব্রিটেন থেকে ফেরার পথে ইরান আসেন এবং সেখানে ইরানের রাজা তাঁকে সম্বর্ধনা জানান। এছাড়া তিনি ক্রিমিয়া, ফ্রান্স, তুরস্ক এবং রাশিয়াও সফর করে এইসব জায়গার বিভিন্ন উচ্চপদস্থ লোকজনের সাথে আলোচনা করেছিলেন।

সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম সংগ্রামী নেতা আহমদউল্লাহ শাহ ফৈজাবাদের মৌলভি হিসেবেই বিখ্যাত ছিলেন। তাঁকে অযোধ্যা অঞ্চলের বিদ্রোহের বাতিঘর

বলা হয়। ব্রিটিশ অফিসার কর্নেল জর্জ ব্রুস ম্যালসন এবং থমাস সিটন আহমদউল্লাহর মনোবল, সাহস এবং সাংগঠনিক দক্ষতার প্রশংসা করেছেন। ১৮৫৭ সালের ভারতবর্ষের বিদ্রোহ নিয়ে ছয় খন্ডে রচিত, 'দ্যা হিস্ট্রি অব মিউটিনি' বইটিতে জি.বি. ম্যালসন বার বার আহমদউল্লাহর কথা উল্লেখ করেছেন। থমাস সিটন আহমদউল্লাহ সম্পর্কে তাঁর বর্ণনায় বলেন–

অদম্য সাহস, দৃঢ় সংকল্প এবং বিশাল ক্ষমতা সম্পন্ন একজন ব্যক্তি। যতদূর জানা যায় বিদ্রোহীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সেরা সৈনিক।

- থমাস সিটন

ভারতে বাবরি মসজিদের স্থানে
মৌলভী আহমদ উল্লাহ শাহের নামে প্রস্তাবিত মসজিদের নকশা

একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম আহমদউল্লাহ শাহ ফৈজাবাদের ধর্মীয় সম্প্রীতি এবং গঙ্গা-যমুনা সংস্কৃতির একজন প্রাণপুরুষ ছিলেন। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহকালে নানা সাহেব এবং খান বাহাদুর খানের মতো রাজকীয় ব্যক্তিত্ব তাঁর পাশাপাশি লড়াই করেছিলেন।

ব্রিটিশরা তাঁকে জীবিত ধরতে পারেনি। তাঁকে ধরার জন্য ৫০,০০০ রৌপ্যমুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। অবশেষে পাওয়ান রাজা জগন্নাথ সিং মৌলভি আহমদউল্লাহকে হত্যা করে, তাঁর কাটা মস্তক ব্রিটিশদের উপহার দেন। যার জন্য পুরস্কার ঘোষিত টাকা রাজা জগন্নাথকে দেওয়া হয়েছিল। পরদিন মৌলভি আহমদউল্লাহর কাটা মাথাটি কোতোয়ালিতে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল।

আহমদউল্লাহর পারিবারিক আদিনিবাস হরদই জেলার গোপামান গ্রামে। তাঁর বাবা গুলাম হোসাইন খান ছিলেন হায়দার আলীর সেনাবাহিনীর একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। তাঁর পূর্বপুরুষগণ অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ

ছিলেন। ব্রিটিশ সেনা অফিসার জি. বি. ম্যালসন মৌলভী আহমদউল্লাহর চারিত্রিক বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন–

মৌলভি ছিলেন একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। তাঁর নাম আহমদউল্লাহ এবং তিনি অযোধ্যার ফৈজাবাদের অধিবাসী। দীর্ঘ, পেশিবহুল দেহের অধিকারী আহমদউল্লাহর চোখ দুটো ছিল বড় বড়, ঘন ভ্রু এবং ঈগলের ঠোঁটের মতো বাঁকা নাক এবং তোবড়ানো গাল।

একটি বিত্তশালী পরিবারের সন্তান আহমদউল্লাহ ছিলেন একজন সুন্নি মুসলমান। ইংরেজি ভাষায় তাঁর ভালো দখল ছিল। প্রথাগত ইসলামি শিক্ষা শেষ করার পর তিনি সমাজসেবা বিষয়েও প্রশিক্ষণ নেন। ইংল্যান্ড, রাশিয়া, ইরান, ইরাক, মক্কা, মদিনা সফর করেন এবং হজ্জ সমাধা করেন।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের আগে আহমদউল্লাহ মনে করতেন একটি সশস্ত্র বিপ্লবে সফলতা লাভ করতে হলে জনগণের সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি দিল্লি. মিরাট, পাটনা এবং কলকাতাসহ আরো কয়েকটি স্থানে সফর করে জনগণের মনে স্বাধীনতার বীজ বপন করেন। তিনি এবং ফজলে হক খায়রাবাদি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে করণীয় বিভিন্ন বিষয়ের ফিরিস্তি লিখে তিনি ফতেহ ইসলাম নামে একটি প্রচারপত্র বিলি করেন। এসবই করা হয় ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ শুরু হওয়ার বেশ আগে।

জি.বি. ম্যালসন আরো বলেন, 'এতে কোন সন্দেহ নেই যে ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রের পেছনে মৌলভী আহমদউল্লাহর ধীশক্তি এবং প্রচেষ্টা বিশেষ অর্থপূর্ণ বা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। রহস্যময় চাপাতি আন্দোলনে রুটি বিলানোর বিষয়টি আসলে তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত একটি ধারণা।

জি.বি. ম্যালসন আরো জানান, মৌলভি আহমদউল্লাহ শাহ যখন পাটনা ছিলেন, তখন হঠাৎ কোন আগাম খবর না দিয়ে পাঞ্জাব থেকে একজন অফিসার পাটনায় এলেন। তার নাম ছিল লেফটেন্যান্ট থার্সবান (একথা রেশমি কুমারি তাঁর রচিত আহমদউল্লাহ শাহকে নিয়ে লেখা বইয়ে উল্লেখ করেছেন)। পকেটে একটি ওয়ারেন্ট নিয়ে তিনি পাটনার সাদিকপুর নামে একটি পল্লীতে এলেন। তারপর আহমদউল্লাহ শাহের ঘরে ঢুকে পুলিশের সহায়তায় তাঁকে গ্রেপ্তার করলেন। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। পরবর্তীতে অবশ্য এই শাস্তি কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

১০ মে ১৮৫৭ সিপাহি বিদ্রোহ শুরু হয়। বিদ্রোহী সিপাহিরা আজমগড়, বেনারস এবং জৌনপুর হয়ে ৭ জুন পাটনায় পৌঁছেন। ওরা ইংরেজ

অফিসারদের বাংলোয় হামলা শুরু করে। ইংরেজরা ইতিমধ্যে প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছিল। শহর দখলের পর বিদ্রোহীরা সরকারি কোষাগার নিজের দখলে নেন। ওরা কারাগারের দিকে এগিয়ে মৌলভি আহমদউল্লাহ শাহ এবং অন্যান্য বন্দিদের মুক্ত করেন। এরপর মানসিংহকে পাটনার রাজা ঘোষণা করে আহমদউল্লাহ শাহ অযোধ্যার দিকে এগিয়ে যান।

অযোধ্যার বিদ্রোহী সেনাদের নেতৃত্বে ছিলেন বরকত আহমদ এবং মৌলভি আহমদউল্লাহ শাহ। চিনহাটের লড়াইয়ে বরকত আহমদকে বিদ্রোহীদের প্রধান সেনাপতি ঘোষণা করা হয়। ব্রিটিশ সেনাদলের নেতৃত্বে ছিলেন হেনরি মন্টগোমারি লরেন্স। ইনি শেষ পর্যন্ত লখনউর দা রেসিডেন্সিতে মারা যান। তীব্র লড়াইয়ের পর বরকত আহমদ এবং মৌলভী আহমদউল্লাহর নেতৃত্বে বিদ্রোহী সেনারা জয়ী হন।

আহমদউল্লাহ বেলিগারাদে একটি আক্রমণ পরিচালনা করেন। কায়সারুতাওয়ারিখ থেকে জানা যায় এই যুদ্ধেও বিদ্রোহীরা বিপুল বিজয় অর্জন করেছিলেন।

সত্যিকার অর্থে অদম্য সাহস ও বীরত্ব দেখিয়ে আহমদউল্লাহ লড়াই করেছিলেন আর তার নেতৃত্বগুনে ব্রিটিশ সেনাদলকে বেলিগারাদের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন। তারপর সেখানে 'মাচ্ছি ভবন' নামে একটি বিশাল ভবন উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

লখনউ বিদ্রোহীদের দখলে আসার পর নওয়াব ওয়াজেদ আলি শাহ এবং বেগম হযরত মহলের দশ বছরের ছেলে বিরজিস কদরকে রাজা ঘোষণা করা হয়। মৌলভি নতুন সরকারের কোন পদে অংশিদার হতে রাজি হননি। তিনি প্রাসাদ রাজনীতি থেকে দূরে সরে গিয়ে গোমতি নদীর অপর পাড়ে ঘামান্দি সিং এবং সুবেদার উমরাও সিং-এর ১০০০ সেনার সাথে যোগ দিলেন।

৬ মার্চ ১৮৫৮ ব্রিটিশ সেনা আবার লখনউ আক্রমণ করলো। এবার সেনাদলের নেতৃত্বে ছিলেন বিখ্যাত ব্রিটিশ সেনাপতি স্যার কলিন ক্যাম্পবেল। অপর দিকে বিদ্রোহী সেনাদলের নেতৃত্বে ছিলেন বেগম হযরত মহল। এই যুদ্ধে ব্রিটিশ সেনা লখনউ পুনরায় দখল করে নেওয়ার পর বিদ্রোহী সেনারা ১৫ এবং ১৬ মার্চ ফৈজাবাদের দিকে হেঁটে চললেন। আহমদউল্লাহর অধীনস্থ ১২০০ বিদ্রোহী সেনার শেষ দলটি ২১ মার্চ শহরের কেন্দ্রস্থলের একটি সুরক্ষিত বাড়িতে অবস্থান নিয়েছিল। সেখান থেকে ব্রিটিশ সেনারা তাদেরকে উচ্ছেদ করার পর সেদিনই লখনউ শহর বিদ্রোহী মুক্ত ঘোষণা করা হয়।

লখনউ পতনের পর মৌলভি আহমদউল্লাহ রোহিলাখন্ডের শাহজাহানপুরে তাঁর ঘাটি স্থাপন করলেন। সেখানে নানা সাহেব এবং খান বাহাদুর খানের সৈন্যরা তাঁর সাথে যোগ দিয়ে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করলেন।

ব্রিটিশ সেনাপতি স্যার কলিন ক্যাম্পবেল ২ মে শাহজাহানপুর থেকে বের হয়ে বেরিলির দিকে এগোলেন। এদিকে মোহাম্মদি জেলার রাজাসহ কয়েক হাজার বিদ্রোহী সেনা নিয়ে মৌলভি আহমদউল্লাহ শাহজাহানপুর আক্রমণ করলেন। ব্রিটিশ সেনা ঘাঁটিতে এই আক্রমণের খবর দেওয়া হল এবং জেনারেল ব্রিগেডিয়ার জোনস ১১ মে শাহজাহানপুর পৌঁছলেন। তবে জোনস আহমদউল্লাকে আক্রমণ করার সাহস পেলেন না, তিনি বেরিলি থেকে আরো ব্রিটিশ সেনা আসার অপেক্ষা করতে লাগলেন। জর্জ ব্রুস ম্যালসন তাঁর বইয়ে লিখেছেন যে–

মৌলভি আহমদউল্লাহই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি স্যার কলিন ক্যাম্পবেলকে দুইবার পরাজিত করতে পারতেন।

১৮৫৭ সালে লক্ষ্ণৌর বিদ্রোহ নিয়ে বৃটিশ চিত্রকরের আঁকা ছবি

১৮৫৮ সালের ১৫ মে বিদ্রোহী সিপাহিদের প্লাটুন এবং জেনারেল ব্রিগেডিয়ার জোনসের রেজিমেন্টের মধ্যে তীব্র লড়াই শুরু হল। উভয় পক্ষেই প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হলেও বিদ্রোহীরা শাহজাহানপুর নিজেদের দখলে রেখেছিলেন। ২০ মে স্যার কলিন শাহাজাহানপুর পৌঁছে চারদিক থেকে বিদ্রোহীদের উপর হামলা শুরু করলেন। সারারাত যুদ্ধ চললো। আহমদউল্লাহ এবং নানা সাহেব শাহজাহানপুর ত্যাগ করলেন। কথিত সূত্রে জানা যায় যে, স্যার কলিন নিজেই আহমদউল্লাহর পিছু নিয়েও তাঁকে ধরতে পারেননি। শাহজাহানপুরের পতনের

পর আহমদউল্লাহ এই শহর থেকে ১৮ মাইল উত্তরে পাওয়ান শহরের দিকে গেলেন।

ব্রিটিশরা মৌলভি আহম্মদউল্লাহকে জীবিত ধরতে পারেনি। তাঁকে ধরার জন্য ওরা ৫০,০০০ রৌপ্যমুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। আহমদউল্লাহ পাওয়ানের রাজা জগন্নাথ সিংকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য রাজি করাতে চেয়েছিলেন। তবে রাজা জগন্নাথ সিং মৌলভি আহমদউল্লাহর আহ্বানে সাড়া দেননি। আহমদউল্লাহ যখন হাতির পিঠে চড়ে রাজা জগন্নাথ সিং এর রাজপ্রাসাদের ফটকের সামনে পৌঁছলেন, তখন ওরা আহমদউল্লাহর উপর কামানের গোলা ছুঁড়লেন। গোলার আঘাতে আহমদউল্লাহ হাতির পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে মারা গেলেন। জি.বি. ম্যালসন তাঁর মৃত্যুর ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছিলেন–

ফৈজাবাদের মৌলভী আহমদউল্লাহ শাহ এভাবেই মারা গেলেন। একজন দেশপ্রেমিক, যদি সেই ব্যক্তি হন, যিনি তাঁর দেশের স্বাধীনতার জন্য পরিকল্পনা এবং সংগ্রাম করেন, আর তাঁকে যদি অন্যায়ভাবে মেরে ফেলা হয়, তাহলে অবশ্যই মৌলভী আহমদউল্লাহ একজন সত্যিকার দেশপ্রেমিক ছিলেন। তাঁর তরবারিতে কোন গুপ্তহত্যার রক্তের দাগ নেই, তিনি কোন হত্যায় সমর্থন দেননি; তিনি সসম্মানে এবং বীরত্বের সাথে অনড়ভাবে যুদ্ধের ময়দানে ভিন দেশী শক্তির বিরুদ্ধে লড়েছেন, যারা তাঁর দেশের স্বাধীনতা হরণ করেছিল। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা সকল জাতির বীর এবং সত্যনিষ্ঠ মানুষের অবশ্য কর্তব্য।

- জি.বি. ম্যালসন।

পাওয়ানের রাজা জগন্নাথ সিং-এর ভাই কুনওয়ার বলদেও সিং মৌলভী আহমদউল্লাহ শাহকে হত্যা করে, তাঁর মাথা কেটে মেজিস্ট্রেটকে উপহার দিলেন। তাঁকে পুরষ্কারের অর্থ দেওয়া হয় এবং ব্রিটিশরা তাকে অনেক সুবিধা দেয়। মৌলভীর কাটা মাথাটি পরদিন কোতওয়ালিতে ঝুলিয়ে রাখা হয়। ১৮৫৭ বিদ্রোহের অপর বিপ্লবী ফজলে হক খায়রাবাদি আহমদউল্লাহর মৃত্যুর ঘটনাটি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা নিয়ে যে মামলা হয়েছিল, সম্প্রতি ভারতের সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী অযোধ্যায় যে মসজিদটি নির্মাণ করা হবে তা আহমদউল্লাহ শাহের নামে করা যেতে পারে।

টাইমস অব ইন্ডিয়া পত্রিকার ২৭ জানুয়ারি ২০২১ সংখ্যার নিম্নলিখিত প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদক কীর্তি পান্ডে এই প্রতিবেদনে বলেন:

দা ইন্দো ইসলামিক কালচারেল ফাউন্ডেশন (IICF), অযোধ্যার ধান্নিপুর এলাকায় নির্মিতব্য মসজিদটি যোদ্ধা-মৌলভী আহম্মদউল্লাহ শাহের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাস্বরুপ তাঁর নামে নামকরণ করার কথা বিবেচণা করছেন। ইনি ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থানে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।

আহমদউল্লাহ শাহের জন্ম ১৭৮৭ খ্রি. এবং ৭০ বছর বয়সে তিনি ১৮৫৭ সালের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন বীর হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধ নেতৃত্ব দেওয়ার ভূমিকায় নামার আগে তিনি ফৈজাবাদে একজন মৌলভী হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।

দা টাইমস অব ইন্ডিয়ার সূত্রে জানা যায়, মসজিদটি নির্মাণ করা জন্য ইউপি সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড যে ট্রাস্ট গঠন করেছেন, সেখানে ওরা নিশ্চিত করেছেন যে, মসজিদটি আহমদউল্লাহ শাহের নামেই হবে। ট্রাস্টের সেক্রেটারি আতাহার হোসাইন জানান:

অযোধ্যা মসজিদ প্রকল্পটি ভ্রাতৃত্ব এবং দেশপ্রেমের একটি নজির হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, মসজিদ ট্রাস্ট এই প্রকল্পটি আহমদউল্লাহ শাহের উদ্দেশ্যে নিবেদন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ট্রাস্টের সূত্রে বলা হয়, ইসলামের সত্যিকার একজন অনুসারি মৌলভী আহমদউল্লাহ শাহ এই সব মূল্যবোধের প্রতিনিধিত্ব করেন।

আতাহার হোসাইন আরো বলেন, 'অযোধ্যা মসজিদ প্রকল্পটি মহান স্বাধীনতা যোদ্ধা মৌলভী আহমদউল্লাহ শাহের স্মৃতির প্রতি নিবেদন করার প্রস্তাবটি ট্রাস্ট অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচণা করছে। বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকেও একই ধরণের প্রস্তাব এসেছে। এটি একটি সুন্দর প্রস্তাব। আমরা আলাপ আলোচনা করার পর আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করবো।'

আহমদউল্লাহ শাহ ৫ জুন ১৮৫৮ শহীদ হন। ব্রিটিশ অফিসার জর্জ ব্রুস ম্যালসন এবং থমাস সিটন তাঁর সাহসিকতা, বিক্রম এবং সাংগঠনিক দক্ষতার কথা উল্লেখ করেন। ম্যালসন তাঁর রচিত হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ান মিউটিনি বইটিতে বার বার আহমদউল্লাহর কথা উল্লেখ করেন। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস নিয়ে বইটি রচিত হয়েছিল।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আহমদউল্লাহ শাহ অযোধ্যা অঞ্চলে বিদ্রোহ সূচনা করেছিলেন। ফৈজাবাদের চক এলাকায় অবস্থিত সরাই মসজিদকে তিনি তাঁর ঘাঁটি তৈরি করেছিলেন। ফৈজাবাদ এবং অযোধ্যার অধিকাংশ এলাকা মুক্ত করার পর তিন বিপ্লবী নেতাদের সাথে এই মসজিদ প্রাঙ্গণেই সভা করতেন।

গবেষক এবং ঐতিহাসিক রাম শঙ্কর ত্রিপাঠির মতে, 'একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম আহমদউল্লাহ শাহ অযোধ্যার ধর্মীয় সম্প্রীতি এবং গঙ্গা-যমুনা সংস্কৃতির একজন প্রাণ পুরুষ ছিলেন। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে কানপুরের রাজপুরুষ নানা সাহেব, আর্‌রাহর কুনওয়ার সিং তাঁর পাশাপাশি ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। চিনহাটের বিখ্যাত যুদ্ধে তাঁর ২২তম পদাতিক রেজিমেন্টের নেতৃত্বে ছিলেন সুবেদার ঘামান. . . ঘামান্দি সিং এবং সুবেদার উমরাও সিং।'

ত্রিপাঠি তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেন, 'উত্তর প্রদেশের শাহজাহানপুর জেলার পাওয়ানের জমিদার রাজা জগন্নাথ সিংকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ে যোগ দেওয়ার জন্য মৌলভী আহ্বান জানান। আগাম খবর না দিয়ে আহমদউল্লাহ ৫ জুন ১৮৫৮ রাজা জগন্নাথ সিং-এর প্রাসাদে হাজির হন। ফটকের সামনে আসতেই জগন্নাথ সিং এর ভাই আহমদউল্লাহকে লক্ষ্য করে কামানের গোলা ছুড়েন। গোলার আঘতে বীর আহমদউল্লাহ সেখানেই মারা যান।

'কাটা মাথাটা একটি কাপড়ে মুড়ে জমিদার জগন্নাথ সিং শাহজাহানপুরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ির দিকে ছুটে চলেন। কাপড়ে মোড়া কাটা মাথা থেকে তখনও রক্ত ঝরছিল। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট তখন তার বন্ধুদের সাথে মধ্যাহ্ন ভোজনে ছিলেন। তবে দুরাত্মা জমিদার তারপরও ছুটে এসে কাটা মাথাটা খাবার টেবিলে ম্যাজিস্ট্রেটকে উপহার দিলেন। তারপর ৫০,০০০ রুপি পুরস্কার নিয়ে জমিদার খুশিতে বাড়ি ফিরে গেলেন।'

৯ নভেম্বর ২০১৯ অযোধ্যার বিতর্কিত বাবরি মসজিদ ও রাম মন্দির নির্মাণের মামলার রায়ে উচ্চ আদালত একটি মসজিদ নির্মাণ করার জন্য পাঁচ একর জমি সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডকে বরাদ্দ করার জন্য কেন্দ্রিয় সরকারের প্রতি নির্দেশ জারি করেন।

রাজ্য সরকার অযোধ্যার সোহাভার তহসিলের ধান্নিপুর গ্রামে পাঁচ একর জমি বরাদ্দ করেন। ১৯ ডিসেম্বর মসজিদটির ব্লুপ্রিন্ট উন্মোচন করা হয়।♦

সূত্র : সৈয়দ উবাইদুর রহমান (১৪ আগস্ট ২০১৯) SIFY.com; কীর্তি পান্ডে-টাইমস অব ইন্ডিয়া, আরশাদ আফজাল খান, দি অয়ার

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)

আ শ ম বাবর আলী

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) ছিলেন উপমহাদেশের একজন প্রখ্যাত আলেম ও ইসলামি চিন্তাবিদ। ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহানপুর জেলার প্রসিদ্ধ দেওবন্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি, মোতাবেক ১৩১৪ হিজরীর ২১ শাবান তারিখে। জন্মের পর পিতামহ তাঁর নাম রাখেন মুবিন। কিন্তু তাঁর পিতা হযরত মাওলানা ইয়াসিন (র) তাঁর মুর্শিদ সে সময়কার বিশিষ্ট সাধক গঙ্গহী (র)-কে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার কথা জানালে গহঙ্গী

(র) সাথে সাথেই সন্তানের নাম 'মুহাম্মদ শফী' বলে তাঁকে জানান। পরবর্তীতে এই নামেই তিনি পরিচিত হন।

পাঁচ বছর বয়সে মুহাম্মদ শফী দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। সেখানে হাফেজ মুহাম্মদ আজিমের কাছে তিনি কুরআন শরীফের নাজেরা অধ্যয়ন শুরু করেন। তাঁর পিতা একজন কাজী ছিলেন। কাজীগিরি করতেন মুজাফ্‌ফর নগরে। অধিকাংশ সময় তাঁকে সেখানে কাটাতে হতো। ফলে পুত্রের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখা তাঁর সম্ভব হচ্ছিল না। তাই কিছুদিন পর পুত্রকে দেওবন্দ থেকে নিয়ে এলেন মুজাফ্‌ফর নগরে। এখানে এনে ভর্তি করিয়ে দেন এক মক্তবে। কিন্তু এখানকার শিক্ষার পরিবেশ মুহাম্মদ শফী (র)'র সহায়ক না হওয়ায় তাঁকে ওখান থেকে বের করে নিয়ে আবার ভর্তি করিয়ে দেয়া হয় দেওবন্দে। এখান থেকেই তিনি নাজেরা সমাপ্ত করেন।

পিতার ইচ্ছা পুত্রকে তিনি কুরআনের হাফেজ বানাবেন। সেই ব্যবস্থাই করেছিলেন। পুত্র শফী (র)ও সেভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন। কয়েক পারা মুখস্থও করে ফেলেছিলেন। কিন্তু মুহাম্মদ শফী (র) অতি শৈশব থেকেই শারীরিকভাবে অনেকটা দুর্বল ছিলেন। হাফেজিত্ব অর্জন করতে যেয়ে যে কষ্টের প্রয়োজন, তা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠছিল না। তাই শেষ পর্যন্ত পূর্ণ কুরআন শরীফের হাফেজ হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কিন্তু যে পর্যন্ত হাফেজ হয়েছিলেন, সেটুকু সারা জীবন যথাযথভাবে মনে রেখেছিলেন। মুখস্থ করা এই কয় পারা দিয়ে অধিকাংশ সময় তিনি নফল ও তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন।

সম্পূর্ণ কুরআনে হাফেজ তিনি হতে পারেননি; কিন্তু কুরআন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানলাভে ব্যর্থ হননি। পিতার কাছ থেকেই তিনি উর্দু এবং ফার্সির অনেক মূল্যবান গ্রন্থ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এ ছাড়া চাচা মুন্সি মঞ্জুর আহমদের কাছ থেকে তিনি অঙ্ক ও জ্যামিতিসহ বেশ কয়েকটি বাস্তবিক বিষয় এবং ক্বারী মুহাম্মদ ইউসুফের কাছ থেকে ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ছরফ, নাহু এবং ফিকাহর অনেক কিতাব তিনি অধ্যয়ন করেন বিশেষ গুরুত্ব সহকারে। মুনইয়াতুল মুছল্লি, হেদায়েতুল্লাহ, ফুসুলে আকবরী প্রভৃতি অতি গভীর ইসলামি চিন্তামূলক গ্রন্থসমূহ এবং আরবী ভাষার প্রাথমিক কিতাবগুলো মাত্র পাঁচ বছর পড়ে সমাপ্ত করেন।

যে কোনো পদ্ধতিতেই হোক, ধর্মবিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা ছিল শফী (র) সাহেবের নেশা। আর এমন কাজেই সব সময় তিনি ব্যস্ত থাকতেন। ছাত্রজীবন থেকেই এ নেশা তাঁর প্রবল ছিল। এ সময়েই জ্ঞান অর্জন করেই তিনি তৃপ্ত হতেন না; সে জ্ঞানকে অন্যের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে আনন্দবোধ করতেন। ছাত্র

হয়ে শিক্ষকদের কাছ থেকে যে শিক্ষা নিতেন, পরক্ষণেই উক্ত বিষয় আবার তাঁর সহপাঠীদেরকে একজন দক্ষ শিক্ষকের মত করে বুঝিয়ে দিতেন। অন্যকে বুঝানোর বিশেষ ক্ষমতাও আল্লাহ তাঁকে প্রদান করেছিলেন। কোনজনকে কোনো বিষয় কি প্রক্রিয়ায় বুঝাতে হয়, মওলানা শফী (র) সাহেব তা খুব ভালোভাবেই জানতেন। এজন্য সব বয়সী, সকল স্তরের মানুষেরা তাঁর কাছে আসতো ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য। এভাবে তিনি সবার মাঝে ইসলাম ধর্ম প্রচারের সুন্দর ও সঠিক প্রচারের এবং মুসলমান হিসেবে সুন্দর জীবন গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

দিনের অধিকাংশ সময় তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে কাটাতেন। সকালে বাড়ি থেকে যাত্রা দিয়ে দারুল উলুমে যেতেন এবং সমস্ত দিন সেখানে কাটিয়ে রাতে বাড়িতে ফিরতেন। ওখানে এটুকু সময় তিনি ধর্মজ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করতেন। কখনো কখনো ফেরার পথে হঠাৎ করে তাঁর মধ্যে বিশেষ এক ধর্মীয় অনুভূতির সৃষ্টি হতো। এ সময় তিনি রাস্তার পাশে কোনো গাছের নিচে শুয়ে পড়তেন। তারপর ওপরের দিকে তাকিয়ে বিশ্বপ্রভুর লীলাচিন্তায় মশগুল হয়ে পড়তেন। কখনো কখনো চিন্তার মাঝে আত্মলীন হয়ে যেতেন। হারিয়ে ফেলতেন সব রকম অনুভূতি। এ ভাবে কেটে যেতো অনেক সময়। অনেক রাত্রি হয়ে যেতো।

এ ছাড়াও প্রতিদিন গভীর রাত পর্যন্ত তিনি ইবাদতে কাটাতেন। রাত যে কত হয়ে যেতো সেদিকে তাঁর খেয়াল থাকতো না। তাঁর এই রাত্রির ইবাদতে পিতা তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করতেন। পুত্রের ইবাদতে যাতে কোনো রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়, সে জন্য পিতা সচেষ্ট হতেন। যখন বাড়িতে ফিরতে তাঁর অনেক রাত হতো, পিতা তাঁর জন্য রাতের আহার নিয়ে অপেক্ষা করতেন। পিতার এমন ব্যাপার তাঁর পছন্দ হতো না। এটা পিতার প্রতি তাঁর বেয়াদবি মনে হতো। তাই পিতাকে তিনি অনুরোধ করেন এমনটি না করার জন্য। কিন্তু বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও পিতা এমন কর্ম থেকে বিরত হলেন না। অবশেষে পিতাকে অনুরোধ করলেন, তাঁর ফিরতে অধিক রাত হলে তিনি সেজন্য অপেক্ষা না করে তাঁর খাবার ঢেকে রেখে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার জন্য। পুত্রের অনুরোধে এখন থেকে পিতা তা-ই করতে থাকেন। অনেক সময় তাঁর ফিরতে এত দেরি হয়ে যেতো যে, ঢেকে রাখা খাবার শীতের রাতে ঠাণ্ডা বরফ হয়ে যেতো। সেটা খেয়ে নিয়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন। দেওবন্দে এভাবে কাটতো তাঁর অধ্যাত্মজীবন।

এছাড়া তিনি শিক্ষকতা করতেন দারুল উলুম দেওবন্দে। এখানে প্রাথমিক জামাতের কিতাবসমূহ শিক্ষাদানের মাধ্যমে তাঁর শিক্ষকতা জীবন শুরু হয়। তারপর উক্ত বিষয়ের ওপর তিনি ক্রমিক উচ্চস্তর পর্যন্ত বছরের পর বছর ধরে পাঠ দিতে থাকেন। এখানে শিক্ষকতার জন্য কর্তৃপক্ষের সাথে তাঁর দিন ৬ ঘন্টার চুক্তি থাকলেও দৈনিক অন্তত ১৮ ঘন্টা তিনি ছাত্রদের পড়াতেন। তাঁর অতি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাদান পদ্ধতি এমন এমন উন্নততর ও বোধগম্য ছিল যে, তাঁর নিয়মিত ছাত্ররা ছাড়াও অন্য দেশ থেকে ইসলামি জ্ঞান আগ্রহী অনেক ছাত্র, এমনকি অনেক অনেক ওস্তাদরা তাঁর কাছে আসতেন। মাওলানা শফী (র)-এর ছাত্র হওয়া, তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করা সৌভাগ্যের ব্যাপার বলে মনে করতেন। দীর্ঘ ২৪ বছর এখানে তিনি শিক্ষকতা করেন।

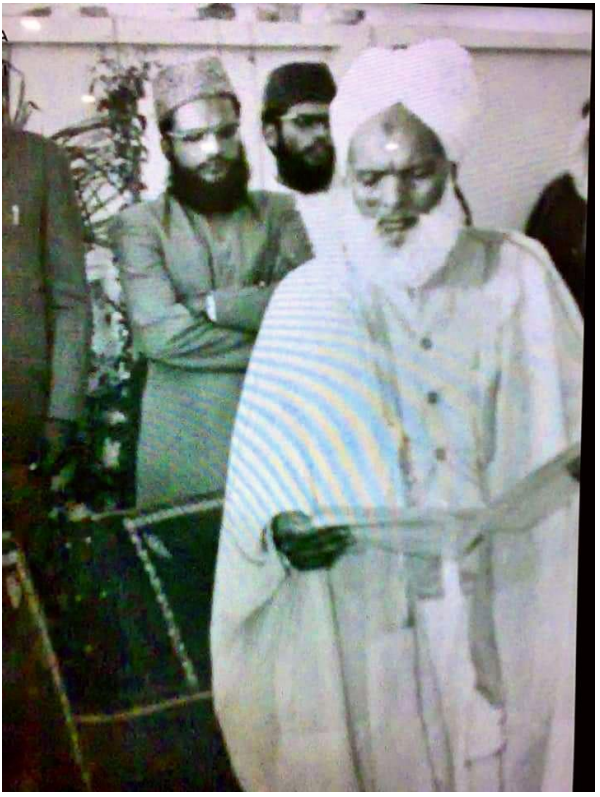

মুফতী মুহাম্মদ শফি (র), ছবি : ইন্টারনেট

এরপর ১৩৭০ হিজরীতে চলে যান করাচীতে। এখানে এসে তিনি বসবাস শুরু করেন। করাচীতে নিজের হাতেই প্রতিষ্ঠা করেন দারুল উলুম, যেটি 'দারুল

উলুম করাচী' নামে পরিচিত হয়। নিজে হন এই ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ প্রধান প্রশাসনিক ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা বা রেক্টর। তাঁর পরিচালনায় অতি অল্পদিনের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি অতি সুনাম অর্জনে সক্ষম হয় এবং সে সুনাম আজও এটি বহন করে চলেছে। বলাবাহুল্য যে, এখানেও শিক্ষার্থীদের মধ্যে উন্নততর পাঠদান কার্য অব্যাহত ছিল।

শ্রেণিকক্ষে তাঁর শিক্ষাদানের বৈশিষ্ট্য ছিল এমন–

- যখন যে বিষয়ে শিক্ষাদান করতেন, শুধু সেই বিষয়ের প্রতি নিজে খেয়াল রাখতেন এবং ছাত্রদেরকে শুধু উক্ত বিষয়ের প্রতি মনোযোগী রাখতে চেস্টা করতেন। এতে তিনি পরিপূর্ণ সফল হতেন এ জন্য যে, তাঁর শিক্ষাদানের পদ্ধতিতে ছাত্ররা বিমোহিত হয়ে শ্রবণ করতো, অন্যদিকে মন দেওয়ার অবসর পেতো না।
- একটি সমগ্র পাঠদানের সময় যে অংশটি বেশি জরুরী বা মূল্যবান মনে হতো, সেই বিষয়টির প্রতি তিনি অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে পড়াতেন।
- মাসের পর মাস অথবা বছরের পর বছর তিনি একই প্রক্রিয়ায় পাঠদান করতেন। গতিও ছিল একই ধরনের। কখনো তাঁর ধারা পরিবর্তন করতেন না। এর কারণ হচ্ছে, ছাত্রদের শিক্ষাগ্রহণ সামর্থ্য বা গতিকে ধরে রাখা।
- প্রতিটি শিক্ষণীয় বিষয় অতি নিষ্ঠার সাথে বর্ণনা করতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি ছাত্র বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে না পারতো, ততক্ষণ তিনি পাঠটি সমাপ্ত করতেন না। যখন বুঝতেন, সবাই বুঝে গেছে তখনই অন্য পাঠে চলে যেতেন।
- কোনো আউলিয়া বা বুজর্গব্যক্তির ওপর পাঠ দিয়ে যেয়ে সবার আগে ছাত্রদের অন্তরে উক্ত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা স্থাপনে প্রয়াসী হতেন। তারপর তাঁদের সম্পর্কে বলতেন।
- যে কিতাবের ওপর বক্তব্য প্রদান করতেন, আগে উক্ত কিতাবের পূর্ণ পরিচিতি অতি বিস্তারিতভাবে ছাত্রদের কাছে প্রদান করতেন।
- শ্রেণিকক্ষে কোনো ছাত্র সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি উক্ত বিয়য়ের ওপর নিশ্চিত হয়েই সঠিক জবাব দিতেন। যেটা পারতেন না, পরের দিন তার জবাব দেবেন বলে ছাত্রদেরকে আশ্বস্ত করতেন। বাসায় ফিরে কিতাব দেখে তা জেনে পরের দিন ছাত্রদের কাছে তা বলতেন।

এত কিছু জ্ঞানলাভ করেও হযরত মাওলানা মোহাম্মদ শফী (র) মনে করতেন, একজন বুযুর্গ ব্যক্তির সাহচার্য এবং তাঁর দ্বারা পথনির্দেশ ব্যতীত ধর্মজ্ঞান পূর্ণ হয় না। তাই তিনি মনে করেছিলেন, মাদ্‌রাসার পড়াশুনা শেষ করে একজন বুযুর্গ ব্যক্তির কাছে যেয়ে তিনি বায়াত গ্রহণ করবেন। এ জন্য শায়খুল হিন্দ হযরত মাহমুদ হাসান (র)-কে তিনি তাঁর জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি বলে মনে করলেন। সেই অপেক্ষায় তিনি ছিলেন। কিন্তু যখন মাদ্‌রাসায় তাঁর উচ্চ শিক্ষাজীবন শেষ করলেন, তখন শুনলেন বিশেষ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে মালার জেলে কারাভোগ করছেন। এটা জেনে একদিকে তিনি যেমন ব্যথিত হলেন, অন্যদিকে নিরাশও হয়ে পড়লেন।

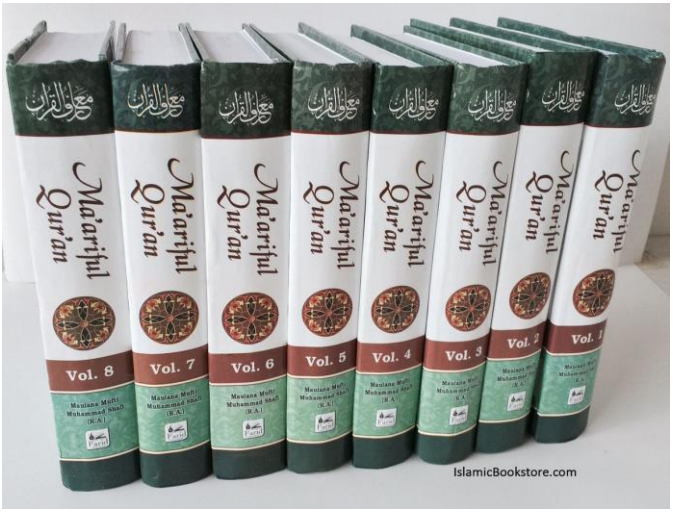

মুহাম্মদ শফি (র)-এর অন্যতম কীর্তি আট খণ্ডে 'তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন'

এই অবস্থায় পিতার পরামর্শ মত তিনি বিশিষ্ট অন্য এক বুযুর্গ ব্যক্তি উত্তর প্রদেশে হযরত আশরাফ আলী থানভী (র)-এর কাছে চলে গেলেন। থানভী (র)-এর কাছে তিনি তাঁর নৈরাশ্যের কথা জানালেন এবং এখন তাঁর করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ চাইলেন। হযরত আশরাফ আলী তাঁকে বললেন যে, শায়খুল হিন্দ হযরত মাহমুদ হাসান কারাগারে আছেন ঠিকই, তবে একদিন তিনি কারাগার থেকে অবশ্যই মুক্তি পাবেন। সে পর্যন্ত তাঁকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। ধৈর্য ধরেই রইলেন শফী (র) সাহেব। এমনিভাবে কেটে গেল অনেক দিন। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর কারাগার থেকে মুক্ত হলেন শায়খুল হিন্দ (র)। এক সময় তাঁর সাথে দেখা করে তাঁর কাছে বায়াত নিলেন মাওলানা শফী (র)। বায়াত প্রদানের ৬ মাসের মধ্যেই ইন্তেকাল করলেন হযরত শায়খুল হিন্দ (র)।

অতিশয় দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়লেন মাওলানা শফী (র)। পছন্দের এক বুযুর্গের কাছে থেকে বায়াত নিয়েও বেশিদিন তাঁর কাছে থেকে উপদেশ গ্রহণের সুযোগ তাঁর হলো না। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তিনি আবার চলে গেলেন হযরত থানভী (র)-এর কাছে। তাঁর কাছে থেকেই ধর্মীয় উপদেশ গ্রহণ করতে এবং তাঁরই নির্দেশ মত চলতে শুরু করলেন।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) ও হযরত মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ শফী (র)'র অধ্যাত্ম জ্ঞানের ওপর অতি বড় আস্থা রাখতেন। সে আস্থা যে কি পরিমাণে ছিল দু'জনের মধ্যের নিম্নোক্ত এক পত্রালাপে তা বিশেষভাবে জানা যায়। সেটি এ রকম–

এক সময় একটি ধর্মীয় ব্যাপারে ব্যাখ্য বা ব্যাখ্যা চেয়ে মাওলানা থানভী (র) সাহেবের কাছে একটা চিঠি লিখেছিলেন মাওলানা শফী (র) সাহেব। চিঠিটা ছিল এই রকম–

'আপনি আমার কাছে যে প্রশ্নের জবাব চেয়েছেন, পত্র পাওয়ার সাথে সাথেই তা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু মধ্যে জরুরি সফর উপস্থিত হওয়ায় জবাবটা পূর্ণ করতে পারিনি। আসল জবাবটি আজকে পাঠিয়ে দিলাম। আশা করি শুদ্ধতা কিংবা ভুল সম্পর্কে আমাকে জানাবেন। যদি কোনো অংশ কিংবা প্রয়োজনীয় কিছু বাদ পড়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সে বিষয়েও আমাকে জ্ঞাত করিয়ে বাধিত করবেন।'

এই পত্রের জবাবে হযরত মাওলানা থানভী সাহেব লেখেন–

'আপনার চিঠি পেয়ে দুটি কারণে আনন্দিত হয়েছি– (১) সন্দেহের নিরসন, (২) আমি দেখছি যে, আল্লাহ তায়ালা আপনার দ্বারা দ্বীনের মহান খেদমতে আনজাম দিবেন।

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)-এর জীবনের সবচেয়ে বড় কীর্তি 'তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন' গ্রন্থটি। উর্দু ভাষায় আট খণ্ডে রচিত বিশাল ও মহাপবিত্র এই গ্রন্থটি। বাংলা ভাষায় আট খণ্ডেই এটি অনুবাদ করেছেন মাওলানা মুহিউদ্দীন খান। প্রকাশ করেছে 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা'।

১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ৬ অক্টোবর ৭৯ বছর বয়সে তিনি করাচীতে ইন্তেকাল করেন। হিজরীতে ছিল ১৩৯৩-এর ১০ শাওয়াল।♦

সংস্কৃতিবান বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধুময় সংস্কৃতি

নাসরীন মুস্তাফা

সংক্ষিপ্ত কথন

হাজার বছরের বাংলা সংস্কৃতি বাঙালির সংস্কৃতি হয়ে ডালপালা ছড়িয়েছে, তবে এর পরতে পরতে মিশে আছে বিদ্রোহের আগুন, জয়ধ্বনি শুনতে পাওয়া গেছে সেই প্রথমবার, ১৯৭১ সালে। হাজারো মত ও পথে বিভক্ত বাঙালি লোকসমাজ সেই প্রথমবার একত্রিত হয়ে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উন্মাতাল হয়েছিল, সেই ১৯৭১ সালেই। বহু বহু মহামনীষী বাঙালির অসম্মান, পরাধীনতার গ্লানি নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন, তবে বাঙালির জন্য নিজস্ব ভূখন্ডের স্বপ্ন কেবল একা নন, সবার মনের ভেতরে প্রোথিত করে সবাইকে স্বাধীনতার দাবিতে এক করার মতো অতি দুরুহ কাজটি ইতিহাসে সম্ভব করতে পেরেছিলেন মাত্র একজন মানুষ, তিনি মহামনীষীদেরও সর্বাগ্রে ঠাঁই পেয়ে গেছেন কেবলমাত্র তাঁর কীর্তিগুণে। তিনি বাঙালির জাতির পিতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জন্ম নিয়েছিলেন বৃটিশ শাসিত পরাধীন ভূমিতে। বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর জন্য সত্যিকারের স্বাধীনতার ব্যাখ্যা তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলেও ইতিহাসের ক্রমচক্রে তিনি কেবল মাত্র তাঁর তরুণ বয়সের 'সীমাবদ্ধতা' মেনে নিয়ে প্রকারান্তরে মেনে নিয়েছিলেন দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষে স্বাধীনতার ছাঁচে ঢালা পরাধীনতার ভূখণ্ড, যার নাম পাকিস্তান। বাঙালি পাকিস্তানের পূর্ব অংশে কেবলমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে ঠাঁই পেলেও শুরু থেকেই বেশি ভালো মুসলিম বনে যাওয়া পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের কাছে বাঙালি যে আচরণ পেয়েছিল, তা হাজার বছর ধরে চলে আসা শাসক শ্রেণি কর্তৃক অপমান আর বঞ্চনার প্রতিরূপ। তরুণ নেতা শেখ মুজিব নিজেকে প্রতারিত ভেবেছিলেন, নিজস্ব মানুষদের প্রতারণা থেকে উদ্ধার করতে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, যার প্রথম প্রকাশ ঘটে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি না দেওয়ার সরকারি ঘোষণায়। বাঙালি সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি যে বাংলা ভাষা, তার সম্মান রক্ষার লড়াইয়ে আবির্ভূত হওয়া নেতা শেখ মুজিব ক্রমশ প্রবেশ করলেন বাঙালি সংস্কৃতি রক্ষার লড়াইয়ে। পাকিস্তানের শাসককূল যখন বাংলা ভাষাকে হিন্দুয়ানি ভাষা নামে অপপ্রচার করে উর্দু হরফে বাংলা লেখার অপপ্রয়াস, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান নিষিদ্ধ করার মতো এরকম অসংখ্য ঘটনা বাংলা ভাষা আর বাংলা সংস্কৃতির পিঠে ছুরি বসানোর আয়োজন সারছিল, তখন বঙ্গবন্ধু সবার মননে স্পষ্ট করে তুলতে পেরেছিলেন এই অনুভব যে, প্রতিটি জাতির নিজস্ব সত্তা থাকে, যা সেই জাতির ভাষা আর সংস্কৃতি বহন করে নিয়ে যায় সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষায়। বাঙালি জাতির জন্য ঠিক এই কারণেই বাংলা ভাষা আর বাংলা সংস্কৃতি শিশুর জন্য মায়ের স্তনের দুধের মতোই অপরিহার্য। সারা বিশ্বে কত ভাষা, কত সংস্কৃতি। এর মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে

বাঙালিকে বাংলা ভাষা ও বাংলা সংস্কৃতিকে মননে লালন করেই এগুতে হবে। এই নিজস্বতা বোধ বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীকার আন্দোলনের প্রতিটি ধাপ অতিক্রমে সাহায্য করেছিল। বাংলার সাধারণ মানুষও খুব সহজেই বুঝতে পেরেছিল তাঁর ভাষা। আর তাই তিনি যখন স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন, তখন বন্দি বঙ্গবন্ধুকে অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে হৃদয়ে লালন করেই বাঙালি সর্বাত্মক জনযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে বাঙালি বাংলাদেশ নামক জাতিরাষ্ট্রকে স্বাধীন করেই ছেড়েছিল। বাঙালি সংস্কৃতি এভাবেই গড়ে তুলেছিল বাঙালির নেতা বঙ্গবন্ধুকে। আর বাঙালির নেতা বঙ্গবন্ধু সংস্কৃতির পটভূমিতেই সম্ভব করতে পেরেছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা। এই বিশাল ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বাঙালি সংস্কৃতি ক্রমশঃ হয়ে উঠেছে বঙ্গবন্ধুময়। এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় এটাই।

বাংলা ভাষা ও স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান সন্তান

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ। এর শুরু হয়েছিলো ১৯৪৮-এ বঙ্গবন্ধুর মাধ্যমেই। 'সিক্রেট ডকুমেন্টস অন বঙ্গবন্ধু' শিরোনামে পাকিস্তানের গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান কীভাবে সচেতন করে তুলছিলেন গণমানুষকে, প্রতিবাদ করছিলেন পাকিস্তানী শোষকশ্রেণির ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। ১৯৪৮-এর ১১ই মার্চ ভাষার দাবিতে তিনি প্রথম গ্রেফতার হন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বে তিনি জেলে ছিলেন। জেলের ভেতরে ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা' ও বন্দিমুক্তির দাবিতে অনশন শুরু করেন। তাঁর অনশন ও গ্রেফতার বাঙালি জনতার কাছে এত গুরুত্ব পায় যে, ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ভাষা শহিদদের শোকে পাথর হয়ে যাওয়া জনমানসে আগুন জ্বলে ওঠে এবং ২৭শে ফেব্রুয়ারি গণদাবির মুখে সরকার তাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

বাঙালিত্বের মূল শেকড় ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত ইতিহাসে লুকিয়ে রয়েছে, যাকে কেন্দ্র করে বাঙালির সাংস্কৃতিক চর্চার দ্রুত বিকাশ ঘটেছিল, তা থমকে দাঁড়ায় পঁচাত্তরের খুনিদের উল্লাসের নগ্ন চীৎকারে। বন্ধ হয়ে যায় মুক্তবুদ্ধির সব শিল্পচর্চা। একাত্তরের পরাজিত শক্তির ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত স্বাধীন-সার্বভৌম দেশকে নিয়ে যায় সন্ত্রাসের করতলে, স্বৈরশাসকের হাতের মুঠোর ভেতর। সঙ্গতকারণেই বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। হত্যাকাণ্ডের পর ভীতসন্ত্রস্ত খুনিরা বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয়তা মুছে ফেলার জন্য

তড়িঘড়ি তাঁর জন্মভিটা টুঙ্গিপাড়ায় তাঁকে কবরস্থ করে। অথচ ইতিহাসের স্বাক্ষ্য হচ্ছে, জীবিত মুজিবের চেয়ে মৃত মুজিব আরো বেশি প্রেরণার উৎসে পরিণত হয়ে উঠলেন। কবি কামাল চৌধুরী তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'টুঙ্গিপাড়া গ্রাম থেকে' লিখলেন এভাবে–

কবরের নির্জন প্রবাসে/ তোমার আত্মার মাগফেরাতের জন্য/ যেসব বৃদ্ধেরা কাঁদে/ আমাদের যেসব বোনেরা/ পিতা, ভাই, সন্তানের মতো/ তোমার পবিত্র নাম/ ভালোবেসে হৃদয়ে রেখেছে/ যেসব সাহসী লোক/ বঙ্গোপসাগরের সব দুরন্ত মাঝির মতো/ শোষিতের বৈঠা ধরে আছে/ হে আমার স্বাধীনতার মহান স্থপতি/ মহান প্রভুর নামে আমার শপথ/ সেই সব বৃদ্ধদের প্রতি আমার শপথ/ সেই সব ভাই-বোন লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রতি আমার শপথ/আমি প্রতিশোধ নেব/ আমার রক্ত ও শ্রম দিয়ে/ এই বিশ্বের মাটি ও মানুষের দেখা/ সবচেয়ে মর্মস্পর্শী জঘন্য হত্যার আমি প্রতিশোধ নেব।

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে বঙ্গবন্ধু : শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, জনগণই সাহিত্য ও শিল্পের উৎস। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনোদিন কোনো মহৎ সাহিত্য বা উন্নত শিল্পকর্ম সৃষ্টি হতে পারে না।

'রাজনীতির কবি' বঙ্গবন্ধু নিজে সারাজীবন জনগণকে সঙ্গে নিয়েই সংগ্রাম করেছেন। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র একটি অংশে তিনি লিখেছেন 'সুজলা, সুফলা বাংলাদেশ সম্পদে ভর্তি। এমন উর্বর জমি দুনিয়ায় খুব অল্প দেশেই আছে। তবুও এরা গরিব। কারণ যুগ যুগ ধরে এরা শোষিত হয়েছে নিজের দোষে। নিজকে এরা চেনে না, আর যতদিন চিনবে না এবং বুঝবে না ততদিন এদের মুক্তি আসবে না।'

বাঙালিকে ভালোবাসা তাঁর কাছে ছিল সবচেয়ে বড় শক্তি, জনগণও তাঁকে পেয়েছিল নিবিড় ভাবে। এ কারণেই তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি আলোড়িত হয়েছে, হচ্ছে এখনো। তিনি নিজেই হয়ে ওঠেন কবিতার পংক্তি, তাঁর উন্নত তর্জনী, পাইপ ও চশমার অনন্য মুখোচ্ছবি চিত্রশিল্পীর তুলিতে উদ্দীপনা জোগায়, রাজনৈতিক পোস্টারে মুদ্রিত তাঁর প্রতিকৃতি সংগ্রামের প্রেরণা হিসেবে কাজ করে, ডাকটিকেট-ম্যুরাল-ভাস্কর্য এবং নাটক-চলচ্চিত্রে তাঁর উপস্থিতি ক্রমাগত বাড়ছে। এর কারণ সহজেই অনুমেয়। শিল্প-সাহিত্যের সেবায় নিবেদিত প্রাণ যারা, তারা অনুপ্রেরণা খুঁজেছেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও আত্মত্যাগে। বিশ্বের যে কোনো বিপ্লব, যেমন রাশিয়ার বিপ্লবের কথা যদি ধরি, অথবা বলিভিয়ার বিপ্লবী চে গুয়েভারার দেখানো বিশ্বকে বদলে

দেওয়ার স্বপ্ন, যা আজও প্রজন্মের পর প্রজন্মকে আলোড়িত করছে। বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছেন তেমনি এক অনুসঙ্গ।

লোকসংস্কৃতির একটি অংশ লোকসাহিত্য। লোককাহিনি, লোকগীতিকা, ছড়া, প্রবাদ, প্রবচন, হেয়ালি, লোকবিশ্বাস, লোকবক্তৃতা, লোকগাঁথা, লোকনাম, লোকসঙ্গীত প্রভৃতি লোকসাহিত্যের এক একটি নিদর্শন। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে লোকসঙ্গীতে যে সব ধারা বিদ্যমান তার মধ্যে আছে– ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, আলকাপ, গম্ভীরা, মারফতি, মুর্শিদি, জারি, সারি, বাউল, নীলের গান, ভাষার গান, দেশের গান, স্বরাজের গান, মুক্তিযুদ্ধের গান, যুদ্ধের গান, কীর্তন গান, যাত্রাগান, পালাগান, ধুয়াগান ইত্যাদি। যুগ যুগ ধরে লোকগানে নীল বিদ্রোহ, পলাশীর যুদ্ধ স্মৃতি, তে-ভাগা আন্দোলনসহ নানা আন্দোলনের কথা বর্ণিত হয়েছে, যা গণমানুষের উপর শোষকের নির্যাতনের প্রামাণ্য চিত্র। অজ্ঞাত নামা লোককবির গানে তাই বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে। সঠিক গবেষণার অভাবে লোককবিদের, লোকগানের রচয়িতাদের নাম-পরিচয় হারিয়ে গেছে। ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টের পর বঙ্গবন্ধুকে মুছে ফেলার সর্বময় কুচেষ্টায় এই হারিয়ে যাওয়ার কাজটি আরও সংহত হয়েছে। বাঙালি জাতির সঠিক ইতিহাস পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রয়োজনে এই হারিয়ে যাওয়া নামগুলোর পুনরুদ্ধার করা অত্যন্ত জরুরী একটি কাজ।

লোকসংস্কৃতিতে বঙ্গবন্ধু প্রবল হয়ে উঠেছিলেন ১৯৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানের সময় থেকে। ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠলেন প্রবলতর প্রভাব বিস্তারকারী শক্তি। কেননা, বাঙালি ও বাংলাদেশের হাজার বছরের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর মতো নেতৃত্ব আর আসেনি, বাঙালি স্বাধীন জাতি-রাষ্ট্রের অধিকারী হতে পারার সাথে সম্পৃক্ত ইতিহাসচর্চায় 'বঙ্গবন্ধু' একটি অনিবার্য নাম হয়ে আছেন, যাঁকে কেন্দ্র করে বাঙালির জাতীয়তাবাদের চেতনা প্রভাবিত হয়েছে, গতি পেয়েছে। তাঁকে ইতিহাসবিদগণ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের রূপকার, স্বাধীনতার স্থপতি এবং বাঙালি জাতির পিতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সামগ্রিক বিশ্ব ইতিহাসে তিনি অন্যতম এক অবিসংবাদিত নেতা রূপে আখ্যাত।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সপরিবারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার শত্রুরা শুরু করেছিল ইতিহাসের পাতা থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলার ঘৃণ্য অপচেষ্টা। একই সাথে চলেছে অপপ্রচার-চরিত্রহননের সুপরিকল্পিত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। লিখিত ইতিহাসে তথ্যের বিকৃতি বা উপস্থাপনার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে ছোট বা হেয় করার

প্রয়াস চালানো হয়েছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে গোয়েবলসিয় তত্ত্বে একটি মিথ্যা হাজার বলে জনগণের মনে সত্য হিসেবে ঠাঁই করে দেওয়ার প্রয়াসে সার্থকতা খুঁজেছে ষড়যন্ত্রকারীরা। ব্যর্থ হয়েছে এই একটি ক্ষেত্রে। লোকসংস্কৃতি তথা লোকইতিহাস মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুকে যথার্থ সম্মানের সাথে সংরক্ষণ করছে, সেখানে কোনো বিকৃতির ঠাঁই হয়নি। লোকমানসের আবেগের আতিশয্য অনেক ক্ষেত্রে দৃশ্যমান, কেননা লোকসঙ্গীতে, লোকছড়ায় বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্র করেই ছড়িয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষের দেশপ্রেম, জাতীয় চেতনা, দেশ তথা ব্যক্তিগত প্রাপ্তির স্বপ্ন। লোককবির বর্ণনায় বাংলাদেশ মানেই বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ।

উদাহরণ হিসেবে বলি, ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুকে অধিকাংশ সময় জেলে বন্দি রাখা হয় যাতে আন্দোলন দানা বাঁধতে না পারে। কিন্তু জেলের ভেতরেও তিনি ছিলেন সোচ্চার। ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর প্রসঙ্গটি খুব কম আলোচিত হয়েছে এক শ্রেণির ঐতিহাসিকদের উন্নাসিকতায়। যদিও লোককবিতায় ঠিকই পাওয়া গেছে সত্য ভাষণ। নাম না এক লোককবির কবিতা এরকম–

‘রাজপথ ফেটে পড়ে
মিছিলের ডাক,
ছাত্র-জনতা আঁকে
বাংলা বর্ণের ছক।
নূরুল আমিন গুলি চালায়
মিছিলের ’পরে
সালাম, রফিক, জব্বার, বরকত
শহীদের কাতারে।
শেখ মুজিব ছিলেন তখন
জেলখানায় বন্দি
আন্দোলন চালাতে বলেন
নাই কোনো সন্ধি।।’

ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাঙালি তার স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজ বপন করতে পেরেছিল। এরপর ধাপে ধাপে, ১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৮-এর সামরিক শাসন জারি, ১৯৬৬’র ছয়-দফা কর্মসূচি, ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান এই সংগ্রামের পথকে প্রশস্ত করেছিলো বলেই ১৯৭০-এর নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা অর্পণ না করে পাক-বাহিনী ঔপনিবেশিক শাসন কায়েমের ষড়যন্ত্র শুরু করে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এরই প্রেক্ষিতে

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ 'অপারেশন সার্চ লাইট' নামে ঘুমন্ত নিরীহ বাঙালির ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়েছিল। অনিবার্য ফলাফল হিসেবে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানী শাসকদের হাতে বন্দি হওয়ার আগে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে শুরু হয় সর্বাত্মক মুক্তিযুদ্ধ। ত্রিশ লাখ শহীদের রক্ত, দুই লাখ মা-বোনের উপর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও তাদের এদেশিয় দালালদের করা চরম নির্যাতনের মূল্যে অর্জিত হয় আমাদের স্বাধীনতা।

অনিবার্যভাবেই ১৯৪৭-এর দেশ ভাগের সময় থেকে ১৯৭১-এর দেশ স্বাধীন হওয়া কালীন বাঙালির জাতীয় জীবনের কেন্দ্রে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ফলত বাঙালির ইতিহাসচর্চায়, কবিতায়, গানে, বাঙালির মননে-সত্তায় বঙ্গবন্ধু এক মহামানবের নাম। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সারা দিয়েই মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধে গেছেন, দ্ব্যর্থহীনভাবে বিষয়টি উঠে এসেছে লোককবির গানে–

'শেখের ডাকে সাড়া দিয়্যা
মুক্তিযুদ্ধে গেনু
যুদ্ধ চলাকালীন বাড়ির
খবরটা পাইনু।
আবেদারে রাজাকারে
ধর্ষণ পরে হত্যা করে
এই পৈশাচিক ঘটনাটা
বলতে চোখে আসে বন্যা।'

বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক গান ধুয়াগান, দুটি দলে বিভক্ত হয়ে প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে 'বাতুনী' বা গোপন তত্ত্বসমূহের উৎঘাটন করা ধুয়া গানের মূল উদ্দেশ্য। এই গানের বিষয়বস্তু বা উপজীব্য সাধারণ মানুষের যাপিত জীবন থেকে শুরু করে ধর্মীয় শাস্ত্র কথা, হাস্য-রসিকতা হলেও মুক্তিযুদ্ধের সময় শুকূর মাহমুদ-এর লেখা ধুয়াগানে এভাবে এসেছিলেন 'মুজিব'–

'২৫ শে মার্চে রাত্রিতে শেখ মুজিবুরকে এরেস্ট কইরা
ধইরা নিল আইয়ুব সরকারে,
বন্দি আমার থাইকা মুজিব ডাইকা বলে বাঙালি
তোমরা একিন দেলে থাক সকলি
ঘরে ঘরে দুর্গ এবার হায় গইড়া তোল সকলে।'

মৈষাল বন্ধুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হওয়া ভাওয়াইয়া গান আর নৌকোর মাঝির গান ভাটিয়ালি বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে, সাথে এসেছে

মুক্তিযুদ্ধের নানা প্রসঙ্গ। প্রচলিত গান– 'মাঝি বাইয়া যাওরে অকূল দরিয়ার মাঝে/ আমার ভাঙ্গা নাওরে মাঝি বাইয়া যাওরে।' এই গানটি কী দারুণভাবে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয় এভাবে–

'মুজিব বাইয়া যাওরে নির্যাতিত দেশের মাঝে জনগণের নাওরে-
মুজিব রে... ।'

গণসংগীত গণমানুষের সঙ্গীত। মেহনতি জনগণের আন্দোলনের গান। হেমাঙ্গ বিশ্বাস গণসঙ্গীতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন– 'স্বদেশ চেতনা যেখানে গণচেতনায় মিলিত হয়ে শ্রমিক শ্রেণির আন্তর্জাতিকতার ভাবাদেশের সাগরে মিশলো সেই মোহনাতেই গণ-সংগীতের জন্ম।' স্বাভাবিকভাবেই ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থানের পর থেকে রচিত হয়েছিলো অসংখ্য গণ-সংগীত, মুক্তিযুদ্ধের সময় এর পালে লেগেছিল তুমূল হাওয়া। স্বাভাবিকভাবেই গণসঙ্গীতেরও নায়ক ছিলেন বাঙালির গণমানুষের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বিচার গানের কবি আবদুল হালিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে গেয়েছেন দারুণ উদ্দীপনাময় গান–

জাতির পিতা মহান নেতা (তাঁরে) ছাড়বি কিনা বল
বন্দিশালার ভাঙব তালা বাঙালি ভাই চলরে চল।।
শোন বলিরে ভুট্টো মিয়া শেখ সাহেবরে দাও ছাড়িয়া
না হয় থাক সাবধান হইয়া আসিতেছে পাগলা ঢল।।

নিরক্ষর গণ-মানুষের জাতীয় চেতনা জাগানিয়া লোকছড়া এবং কবিতায়ও দেখি বাঙালির সংগ্রামের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাঁথা আর বঙ্গবন্ধুর অবিসংবাদিত নেতৃত্বের বয়ান, যা ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে বিবেচিত হবার যোগ্যতা রাখে। খুব জনপ্রিয় হওয়া এরকম একটি ছড়া ছিল–

নিয়াজীরে নিয়াজী
তোরে খামু পিয়াজী
তোরে দিমু শিক্ষা
বুড়িগঙ্গায় ফিক্কা।

অথবা, এই ছড়াটিই কী তীব্র অনুভবের স্বাক্ষর হয়ে আছে–

ইলিশ মাছের তিরিশ কাঁটা
বোয়াল মাছের দাড়ি
টিক্কাখান ভিক্ষা করে
শেখ মুজিবের বাড়ি।

লোককবি আমির আলীর লেখা লোককবিতায় উঠে এসেছে মুক্তিযুদ্ধের বর্ণনা–

‘গড়ছে মুক্তিসেনা যায় না চিনা বাংলার সন্তান
‘জয় বাংলা’ বলিয়া যত হিন্দু-মুসলমান।
থায় টিক্কার দলে মাইরা চলে সামনে যারে পায়
গল হইয়া গেল মানুষ পাঞ্জাবির জ্বালায়।
হাতে অস্ত্র নিল তৈয়ার হল মুক্তি সেনা নামে
গেরিলা সাজিল দেশে টিক্কা নাহি জানে।।
যত হানাদাররা ফাঁপর তারা খাইয়া মুক্তির মাইর
গুঁতার চোটে ভাঙছে তাদের বত্রিশ দাঁতের পাইর।’

আধুনিক কবিতায় বঙ্গবন্ধুর অবস্থান কতটা সংহত, তা বুঝতে ১৯৭১ সালে লেখা কবি অন্নদাশংকর রায়-এর কবিতাটি যথেষ্ট–

‘যতদিন রবে পদ্মা যমুনা গৌরি মেঘনা বহমান,
ততদিন রবে তোমার কীর্তি শেখ মুজিবুর রহমান।’

কবি নির্মলেন্দু গুণের বেশির ভাগ সাহিত্যচর্চা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে। ঐতিহাসিক ‘আমি আজকে কারো রক্ত চাইতে আসিনি’ কবিতায় লিখেছেন–

‘একটি গোলাপ ফুল গতকাল আমাকে বলেছে,
আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি।’

শুধু নির্মলেন্দু গুণ কেনো, কবিরা বড় ভালোবেসে কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলেন, বলতে ভালোবাসেন। কবি মহাদেব সাহা তো লিখেছেনই– ‘শেখ মুজিব আমার নতুন কবিতা’। কবি আল মাহমুদ লিখেছেন– “তিনি যখন বললেন ‘ভাইসব’/গাছেরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেল/ কবিরা বুলেট আর কলমের পার্থক্য ভুলে দাঁড়িয়ে গেল এক লাইনে।”

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর প্রথম কবিতা রচনা করেন নির্মলেন্দু গুণ। ১৯৭৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যতরুণ গোষ্ঠীর একুশের স্মরণিকা ‘এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়’ প্রকাশিত হয়। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর ৩০টি ছড়া ও কবিতার সমাবেশে এটি ছিল প্রথম প্রতিবাদী কবিতার সংকলন, যা আসলে ছিল সামরিক শাসনকে উপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের দুঃসাহসিক এক প্রয়াস। সেখানে ভীষ্মদেব চৌধুরীর ‘পিতা : তোমার জন্যে' শিরোনামে একটি অনন্য কবিতা প্রকাশিত হয়।

জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মম হত্যাকাণ্ডের দুই বছর পর তাঁকে নিয়ে প্রথম গল্প ‘মৃতের আত্মহত্যা’ প্রকাশিত হয় সাহিত্য সাময়িকী ‘সমকালে’, ১৯৭৭ সালের ৩রা নভেম্বর। ‘মৃতের আত্মহত্যা’ গল্প লেখার মাধ্যমে আবুল ফজল বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রথম সাহিত্য-প্রতিবাদের সূচনা করেন। সেই সময়ের

সমাজ-সংস্কৃতিতে স্বৈরশাসকের অনিবার্য প্রভাব থাকলেও প্রতিবাদী কবিতার ধারার শক্তিশালী বিকাশ বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্র করেই বিস্তৃত হয়েছে।

'মৃতের আত্মহত্যা' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সোহেলি বঙ্গবন্ধু হত্যাযজ্ঞের সঙ্গে জড়িত এক খুনি মেজরের স্ত্রী। পঁচাত্তর-পরবর্তী খুনিদের বিদেশি দূতাবাসসমূহে চাকরিতে নিযুক্ত করা হয়েছিল। সোহেলিও স্বামীর সাথে দূর মরুভূমিতে নির্বাসিত জীবনের গ্লানি বহন করছে। উপরন্তু 'খুনির বৌ' ও তার সন্তান বকুল 'খুনির ছেলে' বলেই তার অনুশোচনা আরো তীব্র হয়, ফলত স্বামী য়ূনুসের সঙ্গে তৈরি হয় দূরত্ব। য়ূনুসের অন্যায় খুনের সংশ্লিষ্টতায় সোহেলি হয়ে ওঠে জীবনের প্রতি অনাগ্রহী এক মানুষ। নিজেকে মৃত ভাবতে থাকে সোহেলি। বাংলাদেশে তার বাবার কাছে ছেলে বকুলকে পাঠিয়ে দিয়ে আত্মহত্যা করে অবশেষে।

বাংলা সাহিত্যে, গল্পে, কবিতায়, উপন্যাসে বঙ্গবন্ধু নিয়েছে নিরব বিজয়ের স্থান। সাহিত্যের সেরা ৫০ টি গল্পের মধ্যে কবি আবুল ফজল এর– 'মৃতের আত্মহত্যা', 'নিহত মুখ'; সৈয়দ শামসুল হক এর– 'নিয়ামতকে নিয়ে গল্প নয়'; ইমদাদুল হক মিলনের– 'রাজার চিঠি', 'মানুষ কাঁদছে'; হুমায়ূন আজাদের– 'যাদুকরের মৃত্যু', হুমায়ুন আহমেদ-এর 'দেয়াল'র মতো বিখ্যাত সব গল্প-উপন্যাস বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা। বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছে মিল্টন বিশ্বাস-এর গবেষণা গ্রন্থ 'উপন্যাসে বঙ্গবন্ধু'। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কেন্দ্রে রেখে ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত ২১ জন ঔপন্যাসিকের লেখা ঊনতিরিশটি উপন্যাসের আলোচনা করেছেন গবেষক আউয়াল চৌধুরী, আনিসুল হক, আবদুল মান্নান সরকার, আহমদ ছফা, এ্যালভীন দীলিপ বাগচী, ড. এ

এইচ খান, মহিবুল আলম, মাসরুর আরেফিন, মাসুদ আহমেদ, মুনতাসীর মামুন, মোস্তফা কামাল, মোস্তফা মীর, মোহিত কামাল, শেখ সাদী, শামস সাইদ, স.ম. শামসুল আলম, সমীর আহমেদ, সেলিনা হোসেন, সৈয়দ শামসুল হক, হুমায়ূন আহমেদ ও হুমায়ূন মালিক-এর উপন্যাসে বঙ্গবন্ধু চরিত্রটি রূপায়িত হয়েছে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তো বটেই, ব্যক্তি বঙ্গবন্ধুও কম উজ্জ্বল নন। উদার, দূরদর্শী বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে স্পষ্ট রাজনৈতিক সহকর্মীদের প্রতি নিখাঁদ ভালোবাসা। তিনি বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্মান দেখাতেন। তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা, সাহসী ব্যক্তিত্বে লড়াইয়ের মাঠে পিছুটান দেওয়ার চিন্তা কল্পনাতেও আসে না। পরিবার, সমাজ ও দলের প্রতি দায়বদ্ধ তিনি। তাঁর ছিল শিশুদের প্রতি গভীর মমত্ববোধে। মিল্টন বিশ্বাস ঔপন্যাসিকদের চোখে বঙ্গবন্ধু নানা ব্যঞ্জনে উঠে আসার সংক্ষিপ্তসার করেছেন এই বলে, 'উপন্যাসের কাহিনিতে কেউ কেউ স্মৃতির জানালা খুলে বঙ্গবন্ধুকে দেখেছেন, কেউ বা নিরাসক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করেছেন, কেউ আবার গবেষকের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রচুর তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরেছেন। ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত ও ব্যক্তিমানুষের আকাঙ্ক্ষা সবকিছুই একত্রিত হয়েছে আখ্যানে। উপরন্তু কারো কারো লেখায় নির্মোহ পর্যালোচনা রয়েছে; করেছেন ইতিহাসের পুনর্পাঠ।'

এরকম অসংখ্য উদাহরণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সামগ্রিক বাংলা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির পরতে পরতে, যেখানে বঙ্গবন্ধু আজও আছেন বাংলার সাধারণ মানুষের মনের মণিকোঠায়। বাঙালি জাতিয়তাবাদ লোকসংস্কৃতির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য হয়ে উঠেছিল। বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেবেন, ভাষণের আগে হাওড়ের কবিয়াল দূরবীন শাহ্ এবং এরকম আরও অনেক কবিয়াল-লোকশিল্পী গান গেয়েছেন, গানের কথা ও সুরের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফার মতো স্বাধীকারের চেতনাকে জনমানুষের মননে প্রোথিত করতে সাহায্য করেছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজেও এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন কম না। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুর লেখনী থেকে উঠে এসেছে গ্রামে-গঞ্জে তিনি রাজনৈতিক প্রচারণা গিয়েছেন, সাথে ছিলেন আব্বাসউদ্দীন আহমদের মতো সঙ্গীতশিল্পী। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে এক ভ্রমণে গিয়ে নৌপথে আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠে ভাটিয়ালি গান শোনার অনুপম অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে, এইভাবে, "নদীতে বসে আব্বাসউদ্দীন সাহেবের ভাটিয়ালি গান তাঁর নিজের গলায় না শুনলে জীবনের একটা দিক অপূর্ণ থেকে যেত। তিনি যখন আস্তে আস্তে গাইতেছিলেন তখন মনে হচ্ছিল, নদীর ঢেউগুলিও যেন তাঁর গান শুনছে। তাঁরই শিষ্য সোহরাব হোসেন ও বেদারউদ্দিন তাঁর নাম কিছুটা রেখেছিলেন। আমি আব্বাসউদ্দীন

সাহেবের একজন ভক্ত হয়ে পড়েছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'মুজিব, বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে। বাংলা রাষ্ট্রভাষা না হলে বাংলার কৃষ্টি, সভ্যতা সব শেষ হয়ে যাবে। আজ যে গানকে তুমি ভালোবাস, এর মাধুর্য ও মর্যাদাও নষ্ট হয়ে যাবে। যা কিছু হোক, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতেই হবে।' আমি কথা দিয়েছিলাম এবং কথা রাখতে চেষ্টা করেছিলাম।"

১৯৭১ সালের ২৪ জানুয়ারি তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সংবর্ধনা দিয়েছিলেন সংগীত শিল্পীরা। পরদিন,

২৫ জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকের প্রধান সংবাদ শিরোনাম ছিল বঙ্গবন্ধুর দেওয়া ঘোষণা, যেখানে তিনি বলেছিলেন- 'বাঙালির সাংস্কৃতিক মুক্তি ৬-দফায় সন্নিবেশিত বাংলার মাটিতে জাতীয় একাডেমি হইবেই।'

পরের বছর, স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিষ্ঠা করলেন বাংলা একাডেমি। বাংলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত প্রথম বাংলা সাহিত্য সম্মেলনে কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের আসল কাজটা কি, তা স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, শিল্প-সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলতে হবে এ দেশের দুঃখী মানুষের আনন্দ-বেদনার কথা, সাহিত্য-শিল্পকে কাজে লাগাতে হবে তাদের কল্যাণে। দুর্নীতি শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে সমাজের সব ক্ষেত্রে, সেসব নিয়ে কথা বলতে হবে, লেখনীর মাধ্যমে মুখোশ খুলে দিতে হবে দুর্নীতিবাজ দেশের শত্রুদের।

বঙ্গবন্ধুর লেখা বই : বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা বই

তিনি এক অনন্য রাজনীতিবিদ যার উপরে সবচেয়ে বই প্রকাশিত হওয়ার রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী ইতিহাস চর্চায় মুক্তিযুদ্ধের এমন কোনো বই কল্পনা করা যায় না, যেখানে বঙ্গবন্ধু নেই। তাঁর শত্রুরাও অক্ষম তাঁকে বাদ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা করতে। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতার সংগ্রামের আগেকার এবং পরে বাংলা সাহিত্যে এমন কোন সাহিত্যিক পাওয়া যায়নি যিনি বঙ্গবন্ধু'কে নিয়ে দু'কলম লেখেননি। চীনা, জাপানি, ইতালি, জার্মানি, সুইডেনী বিভিন্ন ভাষায় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা হয়েছে শত শত বই।

১৯৯৮ সালে 'বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু চর্চা' শিরোনামে কেবল বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রণীত গ্রন্থপঞ্জিতে বইয়ের সংখ্যা ১০০০টি। 'মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপঞ্জি' শিরোনামে আবু মো. দেলোয়ার হোসেনের সর্বশেষ সংস্করণে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রকাশিত গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা ৪৭০০ বইয়ের তালিকা রয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৬০০টি বই বাজারে কিনতে পাওয়া যাচ্ছে, বিদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে প্রায় ৪০টি বই। দৈনিক, সাময়িকী ও সংকলনে বের হয়েছে কয়েক হাজার

প্রবন্ধ/নিবন্ধ। এরপরও দুঃখের বিষয় এটাই, বাংলাদেশের সাহিত্যে 'বঙ্গবন্ধু-যুগ' নাম দিয়ে একটি সময়-পর্ব এখন পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। ভারতীয় সাহিত্যে যেমন আছে 'গান্ধী-যুগ', ১৯২০ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও কর্মের ব্যাপক প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়ে ভারতীয় সাহিত্যের দুই যুগের বেশি সময় 'গান্ধী-যুগ' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সে সময়ে ভারতের এমন কোনো ভাষা-সাহিত্য-শিল্পকর্ম নেই যেখানে গান্ধীজি নেই।

১৯৭৭ সালের পর লেখক-কবি-সাহিত্যিকদের অনেকেই সরাসরি বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ জানিয়েছেন সৃজনশীল কাজের মধ্য দিয়ে। কেননা, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পরে কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীরা তুলে ধরার মতো কোনো বিকল্প দেখতে পাননি। পরবর্তীকালের শাসকদের রাজনৈতিক দুরভিসন্ধিমূলক চেষ্টা ছিল বঙ্গবন্ধুকে ছাপিয়ে কাউকে কাউকে মহামানবের স্থানে বসাতে, তা যে কার্যত ব্যর্থ প্রচেষ্টায় পরিণত হয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এক সামরিক শাসক নিজেই কবি হিসেবে পরিচিতি পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কবি-সাহিত্যিকদের আলোড়িত করার মতো ব্যক্তিত্ব এই বাংলাদেশে জন্মেছিলেন একজনই, তাঁর নাম 'বঙ্গবন্ধু'।

বঙ্গবন্ধু প্রচুর শিল্প-সাহিত্যের বই পড়তেন, তাঁর ভাষণ, বক্তৃতা, চিঠিপত্র থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। আল বেরুনীর 'ভারততত্ত্ব' বইটির অনুবাদ হাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আলোকচিত্রটি একজন নিমগ্ন পাঠকের প্রতিকৃতি হয়ে চিরকালীন রূপ লাভ করেছে। বঙ্গবন্ধুর নিজের লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা', 'আমার দেখা নয়াচীন' গ্রন্থে তাঁর পাঠ-সমৃদ্ধ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই লেখালেখির মাধ্যমে তিনি নিজেকে নিয়ে গেছেন দক্ষিণ এশিয়ার মহান নেতা মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহেরু প্রমুখ নেতাদের মতো ভিন্নতর উচ্চতায়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কতটা সাহিত্যপ্রেমিক ছিলেন তা তার 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইটি পড়লেই বুঝা যায়। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে নিজের ২১ বছর বয়সের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে আত্মজীবনীতে লিখছেন, 'একটা ঘটনার দিন-তারিখ আমার মনে নাই, ১৯৪১ সালের মধ্যেই হবে, ফরিদপুর ছাত্রলীগের জেলা কনফারেন্স, শিক্ষাবিদদের আমন্ত্রণ জানান হয়েছে। তাঁরা হলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম, হুমায়ুন কবির, ইব্রাহিম খাঁ সাহেব। সে সভা আমাদের করতে দিল না, ১৪৪ ধারা জারি করল। কনফারেন্স করলাম হুমায়ুন কবির সাহেবের বাড়িতে। কাজী নজরুল ইসলাম সাহেব গান শোনালেন।'

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে অনুরোধ করে, ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেনদরবার করে কবিকে ঢাকায় নিয়ে আসেন, তাঁকে দিয়েছিলেন জাতীয় কবির মর্যাদা। তিনি রাষ্ট্রনায়ক হয়েও শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনকে 'স্যার' সম্বোধন করতেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক কবিতাই কণ্ঠস্থ ছিলো তার। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই নেতার অন্তরজুড়ে। ১৭ জুলাই ১৯৬৬ তারিখে লেখা তাঁর কারালিপিতে আছে রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' পড়তে না পারার খেদ :

"আমার কতগুলি বইপত্র আই বি Withheld করেছে। আমাকে খবর দিয়েছে Reader's Digest, টাইমস, নিউজউইক এবং রাশিয়ার চিঠি, কোনো বই-ই পড়তে দিবে না। পূর্বেও দেয় নাই।...কত অধঃপতন হয়েছে আমাদের কিছু সংখ্যক সরকারি কর্মচারীর। রাজনীতির গন্ধ যে বইতে আছে তার কোনো বই-ই জেলে আসতে দিবে না। জ্ঞান অর্জন করতে পারব না, কারণ আমাদের যারা শাসন করে তারা সকলেই মহাজ্ঞানী ও গুণী!"

এর এক সপ্তাহ পর, ২৪ জুলাই জেলখানায় বাবা-মায়ের কথা স্মরণে এলে বিষণ্ন সন্তান 'খোকা' আশ্রয় নেন রবীন্দ্রনাথের কবিতায় :

'মনে মনে কবিগুরুর কথাগুলি স্মরণ করে একটু শান্তি পেলাম।
বিপদে মোরে রক্ষা করো
এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।'

১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি মাতৃভূমিতে ফিরে আসার পর আবেগাপ্লুত কণ্ঠে দেওয়া ভাষণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বঙ্গমাতা' কবিতার পঙক্তি, 'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী,/ রেখেছো বাঙালি করে মানুষ করনি' উদ্বৃত করেছেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৭২ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি কলকাতায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ভাষণ দেওয়ার সময়ও রবীন্দ্রনাথের 'নিঃস্ব আমি রিক্ত আমি' এবং 'নাগিনীরা দিকে দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস' তাঁর কণ্ঠে সেদিন উচ্চারিত হয়েছিল।

বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের 'আঁধারের রূপ' প্রবন্ধটির কথা এসেছে বঙ্গবন্ধুর 'কারাগারের রোজনামচা'য়। শহিদ বুদ্ধিজীবী-সাংবাদিক-ঔপন্যাসিক শহিদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক' উপন্যাসের কথা এসেছে বঙ্গবন্ধুর কলমে। সেখানে তিনি শহিদুল্লা কায়সারকে বন্ধু বলে সম্মোধন করেছেন। শহীদুল্লা কায়সারের সংশপ্তক উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৫-তে,

এক বছর পর ৪ঠা জুন ১৯৬৬-তে কারাগারে বসে বঙ্গবন্ধু লিখছেন, 'বন্ধু শহীদুল্লা কায়সারের সংশপ্তক বইটি পড়তে শুরু করেছি। লাগছে ভালই...।'

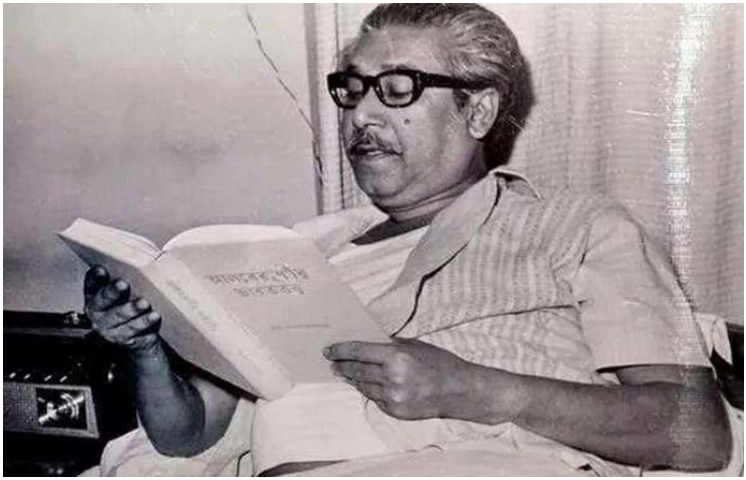

আল বেরুনীর 'ভারততত্ত্ব' বইটির অনুবাদ হাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আলোকচিত্রটি একজন নিমগ্ন পাঠকের প্রতিকৃতি হয়ে চিরকালীন রূপ লাভ করেছে

বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা হয়েছিলো তুর্কি কবি নাজিম হিকমাত, কল্প-বিজ্ঞান লেখক আইজাক অ্যাসিমভের সাথে। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে লিখেছেন, 'রাশিয়ার প্রতিনিধিদেরও আমরা খাবার দাওয়াত করেছিলাম। এখানে রুশ লেখক অ্যাসিমভের সাথে আলাপ হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এই সম্মেলনেই আমি মোলাকাত করি তুরস্কের বিখ্যাত কবি নাজিম হিকমতের সাথে। বহুদিন দেশের জেলে ছিলেন। এখন তিনি দেশত্যাগ করে রাশিয়ায় আছেন। তাঁর একমাত্র দোষ তিনি কমিউনিস্ট। দেশে তাঁর স্থান নাই, যদিও বিশ্ববিখ্যাত কবি তিনি। দেশ-বিদেশের লেখক-সাহিত্যিকদের অনেকেই তাঁকে প্রভাবিত করেছেন, অনেকের সঙ্গে এই মহান নেতার ছিল অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের কয়েক বছর পর এক সম্মেলনে চীন ভ্রমণে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে পরিচয় ও সখ্য গড়ে উঠে কলকাতার প্রখ্যাত সাহিত্যিক মনোজ বসুর। সে সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান মাতৃভাষা বাংলায় বক্তৃতা করেছেন, যা মনোজ বসুকে মুগ্ধ করে। 'আমার দেখা নয়াচীন' গ্রন্থে স্মৃতিচারণায় বঙ্গবন্ধু লিখেছেন মনোজ বসুর প্রতিক্রিয়া, "আমি ইংরেজিতে বক্তৃতা করতে পারি। তবু আমার মাতৃভাষা বলা কর্তব্য। আমার বক্তৃতার পরে মনোজ বসু ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'ভাই মুজিব, আজ আমরা দুই দেশের লোক, কিন্তু আমাদের ভাষাকে ভাগ করতে

কেউ পারে না। আর পারবেও না। তোমরা বাংলা ভাষাকে জাতীয় মর্যাদা দিতে যে ত্যাগ স্বীকার করেছ আমরা বাংলা ভাষাভাষী ভারতবর্ষের লোকেরাও তার জন্য গর্ব অনুভব করি।"

বঙ্গবন্ধুর লিখিত গ্রন্থ, ভাষণ, কথামালায় ফুটে উঠেছে একজন জাত সাহিত্যিকের চরিত্র। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা', 'আমার দেখা নয়াচীন' গ্রন্থের পরতে পরতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে উচ্চ মার্গের সাহিত্যিক সত্ত্বার প্রকাশ। 'বায়ান্নোর দিনগুলো' প্রবন্ধে বোঝা যায়, বঙ্গবন্ধু জেলে বসে টের পেয়েছেন পাকিস্তানিদের পরাজয় সুনিশ্চিত, আর কী সুন্দর করে তিনি লিখেছেন– 'মানুষের যখন পতন আসে, তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে।'

একেবারে সহজ কথা। গণমানুষের বুঝতে একটু কষ্ট হয় না। তাঁর মুখের ভাষা বুঝতে যেমন কোনো কষ্ট হয়নি কারোও। অহেতুক পাণ্ডিত্য তাঁকে ঘিরে ধরেনি কখনো। আর তাই বুঝি তিনি খুব সহজেই জয় করতে পেরেছিলেন সবার হৃদয়।

ভারত ও পাকিস্তানের অনেক কবিই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ত্রিপুরার কবি রাম প্রসাদ দত্ত, মনিপুরের প্রথম সারির কবি এলাংবম নীলকান্ত, পশ্চিম বাংলার বনফুল, বুদ্ধদেব বসু, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মনীষ ঘটক, অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত, বিমল চন্দ্র ঘোষ, দীনেশ দাস, দক্ষিণা রঞ্জন বসু, করুণা রঞ্জন ভট্টাচার্য, অমিয় মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র কুমার গুপ্ত, নলিনীকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, নির্মল আচার্য, অমিত বসু, শান্তিময় মুখোপাধ্যায়, গোলাম রসুল, অমিতাভ দাশগুপ্ত, তরুণ

সান্যাল, দেবেশ রায়, রাম বসু, তারাপদ রায়, গৌরী ঘটক, মনীন্দ্র রায়, বিনোদ বেরা, অমিতাভ চৌধুরী, ভারতের উর্দু কবি কাইফি আজমী, পাকিস্তানের কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, আহমেদ সালিমসহ আরও অনেকেই।

ত্রিপুরার কবি রাম প্রসাদ দত্তের 'ইয়াহিয়া খাঁন তাণ্ডব নৃত্য' শিরোনামে মুক্তিযুদ্ধের উপর ১২৪ পঙক্তির একটি দীর্ঘ পালাগানের ছত্রে ছত্রে এসেছেন শেখ মুজিব। পাকিস্তানের পাঞ্জাবি কবি আহমেদ সালিম পাঞ্জাবি ভাষায় লিখেছেন কবিতা 'বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী' হোক এবং 'সোনার বাংলা'। কবিতা লেখার অপরাধে সামরিক জান্তা তাকে গ্রেফতার করলে লাহোর ডিস্ট্রিক্ট জেলে বসে তিনি আরও একটি কবিতা লেখেন 'সিরাজউদ্দৌলাহ' শিরোনামে এবং এই কবিতাটি উৎসর্গ করেন শেখ মুজিবুর রহমানকে। এই কবিতায় তিনি সিরাজউদ্দৌল্লাহ ও শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীনতার রক্ষক হিসেবে বর্ণনা করে লেখেন, 'স্বদেশি মীরজাফরদের (অর্থাৎ রাজাকার আল বদরদের) সহযোগিতার কারণে রক্তস্নাত হল বাংলাদেশ।'

নয়াদিল্লীর সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত মনিপুরের কবি এলাংবম নীলকান্ত বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর লেখেন 'শেখ মুজিব মহাপ্রয়াণে' শীর্ষক কবিতা।

'হে বঙ্গবন্ধু
নিষ্ঠুর বুলেটের আঘাতে নিহত হয়েছো শুনে
পেরিয়েছি আমি এক অস্থির সময়
খোলা জানালা দিয়ে সুদূর আকাশের দিকে
পলকহীন তাকিয়ে থেকেছি
উত্তরহীন এক প্রশ্ন নিয়ে
বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে গড়ে তুলেছিলে স্বদেশ তোমার
কিন্তু এ কোন প্রতিদান পেলে তুমি?' (অনুবাদক : এ.কে. শেরাম)

মার্কিন লেখক রবার্ট পেইনের 'দি চর্টার্ড এন্ড দ্য ডেমড', সালমান রুশদীর 'মিড নাইট চিলড্রেন' এবং 'শেইম', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের পূর্ব পশ্চিম, জাপানি কবি মাৎসুও শুকাইয়া, গবেষক ড. কাজুও আজুমা, প্রফেসর নারা, মার্কিন কবি লোরী এ্যান ওয়ালশ, জার্মান কবি গিয়ার্ড লুইপকে, বসনিয়ার কবি ইভিকা পিচেস্কি, বৃটিশ কবি টেড হিউজের কবিতায় বঙ্গবন্ধু উপস্থাপিত হয়েছেন যথাযোগ্য মর্যাদায়।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে চলচ্চিত্র

বাংলাদেশ তখনো জন্ম নেয়নি, অথচ এই ভূখণ্ডের নিজস্ব চলচ্চিত্রের যাত্রা শুরু করার পথটি তৈরি করে দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুই। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারকে হটিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার আসে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষমতায় আর তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান হন বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী। এ সময় ঢাকায় একটি স্থায়ী ফিল্ম স্টুডিও স্থাপনের ব্যাপারে তার সঙ্গে আলোচনা করেন আবদুল জব্বার খান, ডক্টর আবদুস সাদেক, নূরুজ্জামান প্রমুখ। বঙ্গবন্ধু সব শুনে 'চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা' প্রতিষ্ঠার বিলের একটি খসড়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরির নির্দেশ দেন। প্রাদেশিক আইন পরিষদের অধিবেশন শেষ হতে মাত্র দু'দিন বাকি ছিল। এ অবস্থায় শিল্প দপ্তরের উপসচিব আবুল খায়ের ও নাজীর আহমদ তাড়াতাড়ি করে এফডিসি বিলের কাগজপত্র তৈরি করেন। এরপর ওই বছরের ৩রা এপ্রিল প্রাদেশিক আইন পরিষদের অধিবেশনের শেষ দিন বঙ্গবন্ধু 'পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা' নামক বিল উত্থাপন করেন। বিলটি আইন পরিষদে পাস হলে যাত্রা শুরু করে পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা, যা আজকের বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা বা বিএফডিসি। পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থার প্রথম নির্বাহী পরিচালক নাজীর আহমদ ১৯৮৫ সালের ১৬ই জানুয়ারি চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) থেকে প্রকাশিত 'সচিত্র বাংলাদেশ' পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'তাঁর (বঙ্গবন্ধু) উৎসাহ না থাকলে বোধহয় এ দেশে এফডিসির জন্ম হতো না। আর জন্ম হলেও হতো অনেক দেরিতে।'

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর থেকে বঙ্গবন্ধু ও চলচ্চিত্র নানা আলোকে উদ্ভাসিত হয়। বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন চলচ্চিত্র নতুন করে ভিত্তি ও এগিয়ে যাওয়ার মন্ত্রণা পায়। এ সময় বাড়তে থাকে চলচ্চিত্রের সংখ্যা। নির্মিত হতে থাকে নব্যধারা ও মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র, সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্র ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার চলচ্চিত্র। অন্যদিকে পুনর্গঠিত হয় এফডিসি, সেন্সর বোর্ড, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, সংযোজিত হয় সেন্সর নীতিমালা। একই সঙ্গে প্রচেষ্টা চলে ফিল্ম ইনস্টিটিউট ও ফিল্ম আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার। এ সময় আন্তর্জাতিক নানা উৎসবে পাঠানো হয় বাংলাদেশের চলচ্চিত্র। দেশে অনুষ্ঠিত হয় বিদেশী চিত্র মেলা এবং চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন নতুন মাত্রা পায়।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রচেষ্টার সূচনা হয় ১৯৭১ সালে এবং ১৯৭২ সালে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কাহিনীচিত্র নির্মাণ। এসবের মধ্যে রয়েছে 'ওরা এগার জন', 'অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী', 'ধীরে বহে মেঘনা', 'আবার তোরা মানুষ হ', 'আলোর মিছিল' ও 'সংগ্রাম'। উল্লেখ্য, 'সংগ্রাম' ছবিতে

অভিনয় করেছিলেন বঙ্গবন্ধু নিজে। বঙ্গবন্ধুর আমলেই নির্মাণ শুরু হয় কালজয়ী উপন্যাসভিত্তিক চলচ্চিত্র 'তিতাস একটি নদীর নাম', ইতিহাসভিত্তিক চলচ্চিত্র 'ঈশা খাঁ', 'লালন ফকির' প্রমুখ। নবীন নির্মাতাদের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা দিতেন বঙ্গবন্ধু। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-১৯৭৮) অগ্রাধিকার পায় চলচ্চিত্র খাত, বরাদ্দ হয়েছিল ৪ কোটি ১০ হাজার টাকা। বরাদ্দকৃত এ অর্থে ফিল্ম স্টুডিওর সম্প্রসারণ, ঢাকা ও চট্টগ্রামে নতুন ফিল্ম স্টুডিও প্রতিষ্ঠা, ফিল্ম ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ও সারা দেশে ১০০টি নতুন প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়। লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়, এ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হবে ছয় হাজার লোকের কর্মসংস্থানের। ১৯৭৩ সালে গঠিত হয় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ ফেডারেশন। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে ১৪-১৫টি চলচ্চিত্র সংসদ গঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর সময়কালে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে প্রবর্তিত সেন্সর আইন ও বিধি সংশোধন করে নতুন সেন্সর আইন ও বিধি প্রবর্তন করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ সিনেমাটোগ্রাফ রুলস, ১৯৭২; দ্য সেন্সরশিপ অব ফিল্মস অ্যাক্ট, ১৯৬৩।

আন্তর্জাতিকভাবে এ দেশের নির্মাতা-কলাকুশলীদের পরিচয় করিয়ে দিতে এবং বাইরের চলচ্চিত্রকে এ দেশের মানুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কতটা উন্মুখ ছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর শাসনামলে আয়োজিত হওয়া চলচ্চিত্র উৎসব, বিদেশে চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের অংশগ্রহণ। ১৯৭৩ সালে ঢাকায় পোল্যান্ড চলচ্চিত্র উৎসব, ১৯৭৪ সালে ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর আমলে বিদেশে বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র প্রতিনিধিত্ব করে, পুরস্কৃতও হয়। ১৯৭২ সালের তাসখন্দ চলচ্চিত্র উৎসবে জহির রায়হানের স্টপ জেনোসাইড পুরস্কার পায়। ১৯৭৩ সালে সুভাষ দত্তের 'অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী' মস্কো, ১৯৭৪ সালে খান আতাউর রহমানের 'আবার তোরা মানুষ হ' ও মিতার 'আলোর মিছিল' তাসখন্দ চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়ে দেশের জন্য বিরল সম্মান বয়ে আনে।

বিদেশী চলচ্চিত্র আমদানি ও প্রদর্শনে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী সিদ্ধান্ত এখনো প্রশংসিত হয় বোদ্ধা মহলে। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে উর্দু ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করা হয়। দেশী চলচ্চিত্রের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর আমলে একই বছর ভারত থেকে শুধু মাত্র বাংলা চলচ্চিত্র আমদানির সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও স্থানীয় চলচ্চিত্র কর্মীদের প্রতিবাদের মুখে সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়। এ দেশীয় আমদানিকারক ও পরিবেশকরা ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে আমদানীকৃত উর্দু, হিন্দি ও ইংরেজি ভাষার চলচ্চিত্র 'বাংলাদেশের সম্পত্তি'

হিসেবে প্রদর্শনের অনুমতি চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু সে দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। বিদেশি চলচ্চিত্র আমদানির পরিবর্তে বঙ্গবন্ধুর আমলেই বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিদেশে রফতানি শুরু হয়। বিভিন্ন ছবি রফতানি বাবদ ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে ২ হাজার, ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে ১১ হাজার ও ১৯৭৪-৭৫ অর্থবছরে ৫ হাজার ডলার আয় করতে সক্ষম হয়।

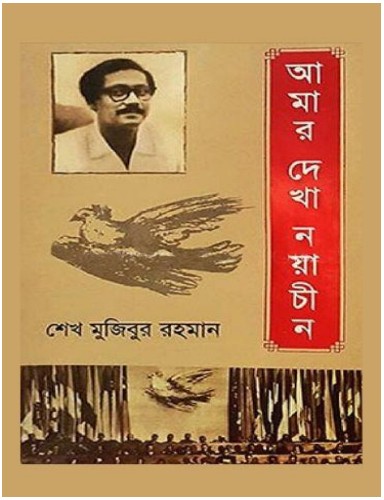

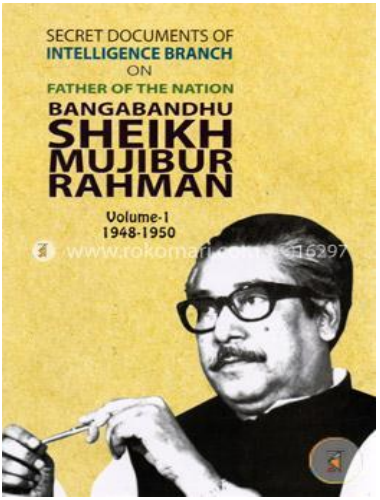

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) সরকারি দায়িত্বের অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নিউজ রিল, তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছে। তবে পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র নির্মিত হয়নি এই প্রতিষ্ঠান থেকে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, দিল্লি থেকে শুরু করে জাপান, রাশিয়া, মিসর, ইরাকে বঙ্গবন্ধুর সফর নিয়ে একাধিক প্রামাণ্যচিত্র নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– অসমাপ্ত মহাকাব্য, চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু, স্বাধীনতা কী করে আমাদের হলো (৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ অবলম্বনে), বঙ্গবন্ধু ফর এভার ইন আওয়ার হার্টস, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম (বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের বিশ্ব স্বীকৃতিবিষয়ক তথ্যচিত্র), আমাদের বঙ্গবন্ধু (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনভিত্তিক একটি প্রামাণ্যচিত্র), সোনালী দিনগুলো (বঙ্গবন্ধু সরকারের সাড়ে তিন বছর), ওদের ক্ষমা নেই ও হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু।

১৯৭০ সালের নির্বাচন থেকে শুরু করে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি এবং বঙ্গবন্ধুর শাসনামলের নানা সময়কাল তথা বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা, প্রতিবাদ, জনসভা, সংবর্ধনা, অসহযোগ আন্দোলন, সাক্ষাত্কার, ৭ মার্চের ভাষণ ও বঙ্গবন্ধুর দেওয়া সাক্ষাৎকার দেশী-বিদেশী মুভি ক্যামেরায় বিধৃত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য

চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে রহমান, দ্য ফাদার অব বেঙ্গল, বাংলাদেশ, ডেভিড ফ্রস্ট প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ, দ্য স্পিচ, পলাশি থেকে ধানমন্ডি, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ। তবে দুঃখ রয়ে গেছে এখনো। ১৯৮২ সালে নির্মিত Richard Attenborough-এর 'গান্ধী' চলচ্চিত্রটি পৃথিবীব্যাপী মানুষকে আন্দোলিত করেছিল। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এ ধরনের ছবি বাংলাদেশে এখনো তৈরি হয়নি, জন্মশতবর্ষে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি 'বঙ্গবন্ধু বায়োপিক' নির্মিত হবার আশায়। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীকে লক্ষ্য রেখে প্রথমবারের মতো বিশাল বাজেট ও বড় আয়োজনে নির্মিত হতে যাচ্ছে তার জীবনীভিত্তিক চলচ্চিত্র। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এটি নির্মাণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ভারতীয় নির্মাতা শ্যাম বেনেগালকে।

মুজিববর্ষে আশা জাগানিয়া উদ্যোগের মাঝে আছে বঙ্গবন্ধুর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণসমূহ বিদেশি ভাষায় অনুবাদের কাজ। বঙ্গবন্ধুর লেখা বইগুলো বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে, হচ্ছে আরও। বাংলা ভাষায় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গবেষণামূলক গ্রন্থের সংখ্যা খুব কম, বিষয়টি সত্যিই দুঃখজনক। সম্প্রতি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গবেষণার প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ক্রমশ হার্ভার্ড-কেমব্রিজের মতো বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়েও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গবেষণার কাজটি শুরু করা জরুরি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি এ ব্যাপারে কাজ করছে। দেশে-বিদেশে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করাসহ আরও অনেক কর্মসূচির পরিকল্পনা থাকলেও বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে কাজটি সম্ভব হয়ে ওঠেনি, তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অবশ্যই সম্ভব হবে। তবে সবচেয়ে জরুরি বিষয় হচ্ছে, বাঙালি সংস্কৃতির বর্তমান ধারাতে বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম, দেশের মানুষের জন্য তীব্র ভালোবাসা, ভাষা এবং বাংলাদেশের যা কিছু নিজস্ব, তার প্রতি প্রগাঢ় মমত্ববোধ সচেতনভাবেই বর্তমান প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন। বৈশ্বিক পরিস্থিতি যত দিন যাচ্ছে, ততই প্রতিযোগিতামুখর হয়ে উঠছে, সেখানে নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রেখে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইলে বাঙালিকে বাঙালি হিসেবেই টিকে থাকতে হবে। এই বিবেচনায় সংস্কৃতিময় বঙ্গবন্ধু এখনো ভীষণ রকমের প্রাসঙ্গিক।♦

ইসলামের সেবায় শেখ হাসিনা পিতার পথে হাঁটছেন

মাহবুব রেজা

১৯৭২ সালের ১৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডেভিড ফ্রস্টকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে খুব পরিষ্কারভাবেই বলেছিলেন, 'আমি একজন মুসলমান এবং মুসলমান একবারই মাত্র মরে, দু'বার নয়। আমি মানুষ। আমি মনুষ্যত্বকে ভালোবাসি। আমি আমার জাতির নেতা। আমি আমার দেশের মানুষকে ভালোবাসি।'

বঙ্গবন্ধুর এই ঔদার্যময় কথাতেই বোঝা যায়, তিনি চিন্তাচেতনায় ও মানসিকভাবে কতটা ধর্মপরায়ণ ছিলেন। সকল ধর্মের প্রতি তাঁর সহানুভূতিও ছিল উল্লেখ করার মতো। দেশ স্বাধীনের পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে নানান উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড হাতে নেন যার মধ্যে ইসলাম ধর্মের সেবা ও এর সুবিধাখাতে কী কী পদক্ষেপ নেয়া যায় সেদিকে বিশেষ নজর ও গুরুত্ব দিয়ে বেশ কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন যা আজও দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। বঙ্গবন্ধু সরকার পরিচালনায় ইসলামের সেবক হয়ে যেসব যুগান্তকারী

পদক্ষেপসমূহ নিয়েছিলেন তা হল ১৯৭৫ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, ১৯৭৩ সালে সীরাত মজলিস প্রতিষ্ঠা, সরকারি তহবিল থেকে হাজীদের অনুদান, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন, বেতার ও টেলিভিশনে কুরআন তেলাওয়াতের অনুমতি প্রদান, মদ, গাজা ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধে আইন তৈরি, কাকরাইল মসজিদের সম্প্রসারণ, রাশিয়াতে প্রথম তাবলীগ জামাত প্রেরণ, ১৯৭৩ সালে আরব ও ইসরাইল যুদ্ধে আরবকে সমর্থন এবং সামর্থ্য অনুযায়ী ত্রাণ প্রেরণ, ১৯৭৪ সালে ওআইসি সম্মেলনে যোগদান এবং মুসলিম বিশ্বের

সাথে সম্পর্ক স্থাপন।

বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে তাঁর সুযোগ্য কন্যা তিন বারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও সরকার পরিচালনার দায়িত্বে থেকে ইসলামের সেবায় নিজেকে সমর্পণ করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এ ব্যাপারে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতিহাসের পথ ধরে একটু পেছনে চোখ বুলালে জানা যায়, বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। তবে বাংলাদেশ নামক এই ভূখণ্ড এক সময় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল না। সপ্তম শতাব্দীতে কিছু আরব মুসলিম ব্যবসায়ী ও সুফি ধর্ম প্রচারকদের মাধ্যমে এই ভূখণ্ডে প্রথম ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছিল। দ্বাদশ শতকে মুসলমানরা বাংলা বিজয়ের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সকল সুফি দরবেশদের মধ্যে অন্যতম একজন হলেন হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র) যিনি ১৪৬৩ সালে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সুদূর ইরাক থেকে এদেশে আসেন। হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র)-এর সফর সঙ্গীদের মধ্যে শেখ আউয়াল ছিলেন অন্যতম। যিনি পরবর্তীতে স্থায়ীভাবে ধর্ম

প্রচারের জন্য যান এবং নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে বসবাস শুরু করেন। অনেক বছর পর তাঁর তৃতীয় প্রজন্মের বংশধর শেখ বুরহানুদ্দিন ব্যবসার উদ্দেশে গোপালগঞ্জে যান এবং টুঙ্গিপাড়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলেন তাঁর চতুর্থ প্রজন্মের বংশধর শেখ লুৎফর রহমানের সন্তান। আর শেখ হাসিনা হলেন শেখ মুজিবুর রহমানের প্রথম সন্তান। সুতরাং জন্মগত ভাবে শেখ হাসিনা ইসলামি শিক্ষা ও আদর্শে গড়ে উঠেছেন। শেখ হাসিনার পূর্ব পুরুষ এই বাংলাদেশের ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন। বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার পূর্ব পুরুষদের অনস্বীকার্য অবদান রয়েছে।

সেই ধারার পরম্পরায় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিন দফায় সরকার পরিচালনা করার সময় শেখ হাসিনা ইসলাম ধর্মের সেবায় প্রচুর কল্যাণমুখী কার্যক্রম, পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নে সার্বিক সফলতা অর্জন করেছেন। তাঁর এই কর্মকাণ্ড দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ইসলাম ধর্মের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রেও তিনি একই মনোভাব পোষণ করেন। শেখ হাসিনার এই দিকটির কথা দেশের আলেম ওলামা, ইসলামি চিন্তাবিদসহ ইসলামী বিশ্বের অনেকেই প্রশংসা করেছেন। এছাড়া তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগেও এ ধরনের অনেক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে।

শেখ হাসিনার উদ্যোগে ইসলামের সেবায় যেসব কার্যক্রম ও কর্মকাণ্ড ইতিমধ্যে সফলতার মুখ দেখেছে তাহলো আল-কোরআনের ডিজিটালাইজেশন, ইসলামী

আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ, দেশের ৩১টি কামিল মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স চালু করণ, যোগ্য আলেমদের ফতোয়া প্রদানে মহামান্য আদালতের ঐতিহাসিক রায়, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের সৌন্দর্যবর্ধন ও সম্প্রসারণ, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের সুউচ্চ মিনার নির্মাণ, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ সাহান সম্প্রসারণ, সৌন্দর্য বর্ধন ও পূর্ব সাহানের ছাদ নির্মাণ, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে মহিলাদের নামায কক্ষ সম্প্রসারণ, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে সাহানের স্থান সম্প্রসারণ। জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম কমপ্লেক্সে ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি ভবন নির্মাণ, বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও রাজকীয় সৌদি আরব সরকারের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর, হজ্জ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, জেদ্দা হজ্জ টার্মিনালে 'বাংলাদেশ প্লাজা' স্থাপন, আশকোণা হজ্জক্যাম্পের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, রেকর্ড সংখ্যক হজ্জযাত্রী প্রেরণ। হজ্জ ব্যবস্থাপনায় সৌদি সরকারের স্বীকৃতি, মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমে আলেম-ওলামাদের কর্মসংস্থান ও বেতন ভাতা বৃদ্ধি, শিশু ও গণশিক্ষা এবং কোরআন শিক্ষা কার্যক্রমে মহিলাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ, জাতীয় শিক্ষানীতিতে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্তিকরণ ও এর ৬ষ্ঠ পর্যায়ে ১৫০০ কোটি ৯৩ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার ফলে ৭৬ হাজার এবং ৫৮ হাজার আলেম-ওলামাদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে, কওমী মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের সনদের সরকারি স্বীকৃতির জন্য আলাদা কমিশন গঠন, ১০০০টি বেসরকারি মাদ্রাসার একাডেমিক ভবন নির্মাণ।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন। ইমাম প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় দেশে ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গঠন করা হয়েছে যেখানে ইতিমধ্যে ১৮১৯১২ জন ইমামকে প্রশিক্ষণ

প্রদান করা হয়েছে। এখাতে এ পর্যন্ত ৩০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা অনুদান হিসেবে মঞ্জুর করে 'ইমাম-মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠন করা হয়েছে, ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্প বাস্তবায়ন, ইসলামিক মিশন কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসা-সেবা প্রদানের ব্যবস্থা। মসজিদ পাঠাগার স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ডিজিটালে রূপান্তর, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলাম শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বিশ্বনেতৃবৃন্দের কাছে বাংলাদেশের আলেম-ওলামাদের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা। মসজিদ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান, চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক আন্দরকিল্লাহ শাহী জামে মসজিদের উন্নয়নে বিশাল অংকের বাজেট অনুমোদন, চট্টগ্রাম জমিয়াতুল ফালাহ মসজিদ কমপ্লেক্স ফাউন্ডেশনের অনুকূলে ন্যস্তকরণ, পবিত্র রমযানে মসজিদে মসজিদে ব্যাপক কোরআন শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে গণসচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ, আন্তর্জাতিক হিফজ, ক্বিরাত ও তাফসির প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের সাফল্য এবং বাংলাদেশ থেকে পর্যাপ্তসংখ্যক হাফেজ ও ইমামদের উচ্চশিক্ষার জন্য মিশর ভ্রমণ, ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশের হাফেজ ও কারিদের বিভিন্ন মুসলিম দেশে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ৫১ কোটি টাকা পুরস্কার পেয়েছে এবং প্রাপ্ত স্বর্ণমুদ্রার পরিমাণ ৪৪৭ ভরি। জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে অনুমোদিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন মডেলে ইসলামী মূল্যবোধের প্রতিফলন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণের ঘোষণা ও বাস্তবায়ন, প্রতি জেলা ও উপজেলা সদরে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের আদলে মসজিদ নির্মাণের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও উপজেলা পর্যায়ে একটি করে মসজিদ সরকারিকরণ, দারুল আরকাম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা, জাতীয় শিক্ষানীতিতে মসজিদ ভিত্তিক একটি গ্রাম একটি মক্তব চালু করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন বাংলাদেশে ইসলামের প্রকৃত পরিচর্যাকারী ছিলেন বঙ্গবন্ধু– আর তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকার হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই হালটি যথাযথভাবে ধরে রেখেছেন। তারা আরও বলছেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইসলামের উন্নয়ন করে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় কর্মকাণ্ডকে যথাযোগ্য মর্যাদায় আসীন করেছেন। ইসলাম ধর্মের প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের জন্য মুসলিম সম্প্রদায়কে উৎসাহী করার কৃতিত্ব সম্পূর্ণ তার।♦

এমন মানুষ বাংলায় আর আসবে না

ড. জিল্লুর রহমান খান

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. জিল্লুর রহমান খান ২২ মে বিকেলে ফ্লোরিডার ওরল্যান্ডোতে একটি নার্সিং হোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার বয়স হয়েছিলো ৮৭ বছর। তিনি বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ইউএস-এর সভাপতি ছিলেন ১৯৮২ সাল থেকে ৩৯ বছর। তিনি সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা আওয়ামী লীগের একজন উপদেষ্টা ছিলেন।

এক সময় যুক্তরাষ্ট্র তথা সারাবিশ্বের সর্বোচ্চ ভবন 'শিকাগো টাওয়ার'র স্থপতি এফআর খানের ভাই জিল্লুর আর খান শিক্ষকতা এবং মৌলিক লেখালেখির জন্যে বহু পুরস্কার পেয়েছেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ইউনিভার্সিটি অব উইসকনসিনের রোজবুশ প্রফেসর এমিরিটাস ছিলেন। অধ্যাপক জিল্লুর গত ৬০ বছর ধরে শিক্ষকতা করেছেন। এছাড়া আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সমিতির সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন অত্যন্ত সুনামের

সাথে। তার লেখা ১২টি গ্রন্থ সারাবিশ্বে সমাদৃত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন জার্নালে তার কমপক্ষে ৫০টি গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশ পেয়েছে।

খ্যাতনামা এই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর চিন্তার প্রতিফলন হিসেবে প্রকাশিত গ্রন্থের অন্যতম হচ্ছে– 'লিডারশিপ ইন দ্য লিস্ট ডেভেলপমেন্ট ন্যাশন : বাংলাদেশ' (১৯৮৩), 'মার্শাল ল' টু মার্শাল ল' : লিডারশিপ ক্রাইসিস ইন বাংলাদেশ' (১৯৮৪), 'দ্য থার্ড ওয়ার্ল্ড কারিশমা : শেখ মুজিব এ্যান্ড দ্য স্ট্রাগল ফর ফ্রিডম' (১৯৯৬) ইত্যাদি। ২০১৪ সাল থেকে তিনি বাংলাতেও লেখালেখি শুরু করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থ 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সম্মোহনী নেতৃত্ব ও স্বাধীনতার সংগ্রাম' জাতির পিতার রাজনৈতিক জীবনের ধারাবিবরণী হিসেবে সমাদৃত হচ্ছে। তার সম্মানে এই লেখাটি পুনঃপ্রকাশিত হলো–

বাংলাদেশ জন্মের নেপথ্যে রয়েছে– জাস্টিস। জাস্টিস অর্থাৎ ন্যায়বিচার না থাকলে বাংলাদেশ হতো না। আবার ইনফরমেশন না হলে ন্যায়বিচার হতো না। জাস্টিস আর ইনফরমেশন পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যথাযথ তথ্য ছাড়া জাস্টিস হয় না এবং জাস্টিস ছাড়াও ইনফরমেশন হয় না। জাস্টিসের ধারণা আমরা পাই খ্রিষ্টের জন্মের ৪০০ বছর আগে সক্রেটিসের কাছে। জাস্টিসের ধারণাটা তিনি তুলে ধরলেন। আবার নিজের জীবনটাও তিনি দান করলেন জাস্টিসের জন্য।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন করেছে বাঙালিরা, এমনকি পাকিস্তান সৃষ্টির নেপথ্যেও প্রধান অবদান বাঙালিদের। অথচ পাকিস্তান সৃষ্টির পর পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে তাদের অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ বানিয়ে ফেলল। আর এই উপনিবেশ তৈরির কৌশলটা তারা শিখে নেয় ব্রিটিশদের কাছ থেকেই। উপনিবেশবাদের বৈশিষ্ট্য হলো তথ্যকে নিয়ন্ত্রণ করা। তথ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ তৈরি করা যায় না। পশ্চিম পাকিস্তানিরা তথ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করল– এটা শুরুতেই বুঝতে পারলেন এ কে ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী ও বঙ্গবন্ধু। আর তথ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার বড় হাতিয়ার হলো ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করা। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে হবে– এই ব্যাপারে কোনো আপস ছিল না। হ্যাঁ, পশ্চিম পাকিস্তানিদের আরো একটা ভাষা আছে, সেই ভাষাসহ দুটো রাষ্ট্রভাষা হতেই পারে। সুইজারল্যান্ডে তো চারটে রাষ্ট্রভাষা আছে। ১৯৪৮ সালে কার্জন হলে জিন্নাহ যখন বললেন, উর্দু হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, তখন এর বিপক্ষে যারা প্রতিবাদ করেছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার ব্যাপারে পাকিস্তানিদের ভয়টা ছিল মূলত তথ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার। কারণ ভাষা নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই তথ্য নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। আর তথ্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কায়েম করা যাবে অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদ। এই কারণে পাকিস্তানিরা ভয় পেত বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে।

৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের সময় আমি রেসকোর্স ময়দানে ছিলাম। আমার ছাত্রছাত্রীরা বলছিল, ইউডিআই অর্থাৎ ইউনিলেটারল ডিক্লারেশন অব ইনডিপেনডেন্স। কিন্তু বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত দূরদর্শিতার সঙ্গে তখনই স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন না। কারণ, তাহলে তখনই রক্তের নদী বয়ে যেত। তিনি তার ভাষণে অত্যন্ত সুন্দরভাবে যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরে বললেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানিরা সরকার গঠন করতে দেয়নি, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধুই ছিলেন ডি ফ্যাক্টো সরকার প্রধান। তিনি যা বলতেন বাঙালি সরকারি কর্মচারীরা সেটাই শিরোধার্য করতেন, সেটাকেই 'আদেশ' হিসেবে মেনে নিতেন। আসলে ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধু যে ন্যায়বিচারের চিত্র তুলে ধরেছিলেন, সেটা ছাড়া কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না।

ন্যায়বিচারটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ন্যায়বিচার কীভাবে হয়? তথ্যের মাধ্যমে হয়। অর্থাৎ সঠিক তথ্য ছাড়া ন্যায়বিচার হয় না। সেই কারণে ২০০৯ সালে এসে বাংলাদেশে আমরা যে তথ্য অধিকার আইন করতে পারলাম, এটা একটা বিরাট অর্জন। তবে মনে রাখতে হবে, আইন তো অনেক হয়, কিন্তু আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। পত্রিকায় দেখলাম, নারায়ণগঞ্জে কিছুদিন আগে নির্বাচিত এক নারী নেত্রী বলেছেন, তিনি যদি কাজ না করতে পারেন তবে তিনি পদত্যাগ করবেন। কিন্তু পদত্যাগ করার আগে তিনি সংবাদ সম্মেলন করে সবাইকে জানিয়ে যাবেন, কেন তিনি কাজ করতে পারছেন না। তার ব্যর্থতার কারণ জানিয়ে তিনি পদত্যাগ করবেন। একজন নেতার জন্য এটা একটা দারুণ পদক্ষেপ।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সখ্য ছিল। আমাকে তিনি 'আমেরিকান প্রফেসর' বলে ডাকতেন। ১৯৭৫ সালের ১৭ জুলাই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমি গিয়েছিলাম আমার ভগ্নিপতি এনায়েতুল্লা খানের ব্যাপারে। এনায়েতুল্লা খান ছিলেন হলিডে পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক। বাকশালকে এনায়েতুল্লা খান সমালোচনা করে লিখেছিলেন ওয়ান পার্টি সিস্টেম বলে। কথাটা এমন ছিল যে, বাকশাল অ্যাজ ওয়ান পার্টি সিস্টেম ইজ লাইক ডিক্টেটরশিপ। বাকশাল নিয়ে আরো নানা ধরনের সমালোচনা ছিল বলে বঙ্গবন্ধু এনায়েতুল্লা খানকে গ্রেফতার করে সিলেটের কারাগারে পাঠিয়ে দেন। আমার

বাবা ফরিদপুরের খানবাহাদুর আবদুর রহমান খানকে বঙ্গবন্ধু পছন্দ করতেন, আমাকেও সেই কারণে অত্যন্ত স্নেহ করতেন তিনি। ভগ্নিপতি গ্রেফতার হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর কাছে ছুটে যাই। আমার ভগ্নিপতির প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বললেন, আমাদের ফরিদপুরের আবদুর রহমান খান তার একমাত্র মেয়ের সঙ্গে বরিশালের মুসলিম লীগের আবদুর জব্বার খানের ছেলের বিয়ে দিলেন কেন? তারপর তিনি বললেন, তোর ভগ্নিপতি উলটোপালটা কেন লেখে? আমি বললাম, 'প্রিয় বঙ্গবন্ধু, আপনার জার্নালিস্ট যারা আছেন, মনে করবেন তারা আপনার জুতা পরেই ঘোরাফেরা করছেন। আপনি তাদের কাছ থেকে সঠিক তথ্য পাবেন না। অ্যারিস্টটল বলেছেন, Only the wearer knows where the shoe pinches. তখন আমি বঙ্গবন্ধুর কাছে প্রকৃত ইনফরমেশনের কথাটা তুলে ধরলাম। তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন, তারপর বললেন যে, এইভাবে তো কেউ তাকে বলে নাই। তিনি এনায়েতুল্লার মুক্তির ব্যবস্থা করলেন।

আসলে বঙ্গবন্ধুকে যদি কেউ যথাযথ তথ্য দিয়ে বুঝিয়ে বলতে পারতেন, তিনি তৎক্ষণাত্ ঠিক ঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। বাকশালের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু বললেন, এটা আমি সাময়িকভাবে করেছি, যখনই বুঝব এর দরকার নাই, তখনই এটা আর থাকবে না। তুই তো রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, তুই তো জানিস– এমার্জেন্সি হলো ওয়ানপার্টি সিস্টেম। তার মানে এটা চিরকালীন নয়। এটা সাময়িকভাবে আছে। তোরা মনে করিস না এটা হিটলার বা মুসোলিনির মতো ঘাপলা। এটা সাময়িকভাবে করা হয়েছে এবং পরবর্তী নির্বাচনটা হবে বহুদলীয়।

বঙ্গবন্ধুর এই কথা এখন পর্যন্ত কেউ লেখেনি। এটাও একটা বড় ইনফরমেশন। এই তথ্য দিয়ে বোঝা যায় বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিভঙ্গি। ১৯৭৩ সালে পাঁচটি বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বাংলাদেশে এনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করিয়েছিলাম। পাকিস্তানি আমলে বঙ্গবন্ধু যখন জেলে থাকতেন তখন প্রচুর পড়তেন। শিক্ষার্থীদের প্রতি তার ছিল ভীষণ দুর্বলতা। তিনি প্রাণ খুলে কথা বললেন আমার ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে। আমেরিকান শিক্ষার্থীরা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথা বলার পর আমাকে বলল, 'ড. খান, হি ইজ এ গ্রেট লিডার। ইউ হ্যাভ ব্রট আস টু এ গ্রেট লিডার।'

শেক্সপিয়রের মতো বলতে হয়– দিজ ওয়াজ এ ম্যান হোয়েন কামস অ্যানাদার। এমন মানুষ বাংলায় আর আসবে না।♦

লেখক : যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস প্রফেসর, ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন আরসি-৩৭-এর চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন, ইউএসএর প্রেসিডেন্ট

শেখ মোহাম্মাদ আবদুল্লাহ চির স্মরণীয় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী

মিরাজ রহমান

১৯৮০ সালের ২৫ জানুয়ারি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি পৃথক মন্ত্রণালয় হিসেবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যাত্রা শুরু হয়। নামকরণ করা হয় Ministry of Religious Affairs। ১৯৮৪ সালের ০৭ জানুয়ারি মাননীয় মন্ত্রী হিসেবে মাহবুবুর রহমানের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে ২০১৯ সালের ০৭

জানুয়ারি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শেখ মোহাম্মাদ আবদুল্লাহর দায়িত্ব গ্রহণ পর্যন্ত মোট ১৮ জন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপদেষ্টা এ মন্ত্রণায়ের অভিভাবকের আসনে সমাসীন হয়েছেন।

কেবল আক্ষরিক অর্থে নয়; ১৯৮০ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত– ৪০ বছরের ইতিহাসে কর্মদক্ষতাপূর্ণ ব্যবস্থাপনা গুণ, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, কর্মকান্ডগত ব্যাপ্তি ও সফলতা, আলেম-উলামা ও পীর-মাশায়েখবান্ধব জনপ্রিয়তা এবং গণমুখি কল্যাণকর কর্মসূচি বাস্তবায়নসহ সব ধর্মের অনুসারীদের বসবাসস্থল বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক চেতনা সমুন্নত রাখার বিবেচনায় স্বাধীন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর উপাধিতে আলহাজ অ্যাডভোকেট শেখ মোহাম্মাদ আবদুল্লাহকে ভূষিত করলে কোনো অত্যুক্তি হবে না বরং এটাই হবে তার যথার্থ মূল্যায়ন এবং যথাযোগ্য স্বীকৃতি।

রাজনীতিতে তিনি যেমন ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্নেহ্যধন্য আদর্শ সৈনিক; ধর্ম পালন ও আধ্যাত্মবাদের সাধনায় তেমন ছিলেন অলিকুল শিরোমনী সদর সাহেব হুজুর আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরি (র)-এর সংস্পর্শশুভ্রতায় আলোকিত শিষ্য। বহু বক্তৃতায় শেখ আবদুল্লাহ বলেছেন, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমার রাজনৈতিক নেতা। আর আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরি (র) আমার ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতা।' ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মনোনায়নে টেকনোক্র্যাট কোঠায় এ সরকারের ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন অ্যাডভোকেট শেখ মোহাম্মাদ আবদুল্লাহ।

প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর পরই তিনি মন্ত্রণালয় ও তার আওতাধীন দপ্তরসমূহের সব কর্মকর্তাদের সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দূর্নীতিমূক্তভাবে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করেন এবং শক্ত হস্তে তা বাস্তবায়নও করেন। হজ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ও কর্যকরি বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তার দায়িত্বপালনকালে। তার একান্ত চেষ্টায় রাজকীয় সৌদি সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছায়। এরই ধারাবাহিকতায় হজযাত্রীর কোটা বৃদ্ধি ও বিমানভাড়া কমানোসহ সৌদি আরবে হাজীদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান এবং ঢাকায় ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করার মতো অসম্ভব সব ব্যবস্থানাও বাস্তবায়িত হয়। এছাড়া জেদ্দা বিমানবন্দরের হজ টার্মিনালে এয়ারকন্ডিশন স্থাপনের জন্য সফল আলোচনা করে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগও গ্রহণ করেন তিনি। সর্বপরি তার নেতৃত্বে বহুকাল পর বাংলাদেশী হজযাত্রীরা সুষ্ঠু ও সুন্দর

এবং সহজ ও সফলভাবে পবিত্র হজব্রত পালনের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। হজপালনকেন্দ্রিক সফল ও গণবান্ধব কর্মকান্ড বাস্তবায়নের কারণে আওয়ামী লীগ দলসহ ক্ষমতাসীন সরকার ও দেশের আপামর মুসলিম জনসাধারণের পক্ষ থেকে ভূষসী প্রশংসা ও স্বীকৃতি এবং ভালোবাসা ও সম্মাননা অর্জন করেছেন শেখ মোহাম্মাদ আবদুল্লাহ।

২০১৯ সালে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ হজ ব্যবস্থাপনা উপহার দেওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ৫৮ জন আলেম-উলামা ও পীর-মাশায়েখকে সরকারিভাবে হজব্রত পালনে নেওয়ার ব্যবস্থা করে অনন্য নজির সৃষ্টি করেন তিনি। বাংলাদেশের ইতিহাসে এর আগে কখনো সরকারিভাবে এতোজন আলেম-উলামাকে হজে পাঠানো হয়নি। শুধু হজে পাঠানোই নয়; সব মত ও পথের আলেম-উলামাগণকে এর আগে কোনো উদ্যোগেই এভাবে একত্রিত হতে দেখা যায়নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় এ উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে শুধু দেশেই নয়; ৫৬ হাজার বর্গমাইলের এই সীমানা ছাপিয়ে সৌদি সরকারের মন্ত্রী, উপমন্ত্রীসহ হজ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ভূয়সী প্রশংসা ও স্বীকৃতি লাভ করেছেন শেখ মোহাম্মাদ আবদুল্লাহ। উল্লেখ্য ২০১৯ সালের হজ পরবর্তী সময়ে পবিত্র কাবা ঘর ধৌত করার মহতি আয়োজন-উৎসবে বাংলাদেশে থেকে প্রথমবারের মতো কোনো মন্ত্রী হিসেবে শেখ মোহম্মাদ আবদুল্লাহ আমন্ত্রণও পেয়েছিলেন।

ক্ষমতাসীন সরকারের সঙ্গে আলেম-উলেমা, পীর-মাশায়েখ ও বিভিন্ন ইসলামী রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ। কাওমী মাদরাসায় অধ্যয়নরত লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর শিক্ষাসনদের সরকারি স্বীকৃতির বিষয়ে তার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আলেম-উলামাদের মহাসমাবেশে প্রথমবারের মতো মসজিদুল হারাম এবং মসজিদে নববীর সম্মানিত ইমাম ও খতিবদের বাংলাদেশে আগমনের ব্যবস্থাপনায় মুখ্য ভূমিকাও পালন করেছেন তিনি। অ্যাডভোকেট শেখ মোহাম্মাদ আবদুল্লাহর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে তাবলিগ জামাতের চলমান বিবাদ নিরসন করে ২০১৯ ও ২০২০ সালে শান্তিপূর্ণ ও সফলভাবে উভয় পক্ষের বিশ্ব ইজতেমা আয়োজিত হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্প সারাদেশে ৫৬০টি মডেল মসজিদ নির্মাণের কাজ তরান্বিত করায় ভূমিকা রাখেন এবং এ প্রকল্পের তদারকি করতে বিভিন্ন জেলায় সফরও করেন তিনি। এছাড়া হাজার হাজার আলেম-উলামার

কর্মসংস্থানস্থল মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্পের ৭ম পর্যায় অনুমোদনে আন্তরিক অবদান রাখেন শেখ মোহাম্মাদ আবদুল্লাহ। উল্লেখ্য, দীর্ঘ দিন যাবত ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গভর্নরসের সম্মানিত গভর্নর হিসেবেও অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছেন তিনি।

সর্বশেষ করোনা মহামারির সময় স্বাস্থ্যবিধি মেনে সামাজিক ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে ইবাদত/উপাসনা পালন বিষয়ে আলেম-উলামা ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের পরামর্শ গ্রহণ করে সময় উপযোগী বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদানের নেপথ্যে তার ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। করোনা মহামারির আঘাতে জীবন-জীবিকার যাতাকলে পিষ্ঠ আলেম-উলামা, মসজিদের খতিব, ইমাম, মোয়াজ্জিন ও খাদেমদের প্রধানমন্ত্রী পক্ষ থেকে এবং ধর্ম মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে বিভিন্ন সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানগত সরকারি সব উদ্যোগেই নেপথ্যে কাজ করেছেন শেখ আবদুল্লাহ। এছাড়া দুর্যোগপূর্ণ এ সময়ে ব্যক্তিগতভাবেও দল-মত ও ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বহু অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি। মুসলিম সম্প্রদায় এবং আলেম-উলামা ও পীর-মাশায়েখদের পাশাপাশি হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়সহ সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়কে নিয়ে অসম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণে তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর চেতনা লালনকারী এক ব্যক্তিত্ব।

শেখ মোহাম্মাদ আবদুল্লাহ ১৯৪৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জ জেলার মধুমতী নদীর তীরবর্তী কেকানিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ধার্মিক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম শেখ মোহাম্মাদ মতিউর রহমান এবং মাতার নাম মোসাম্মৎ রাবেয়া খাতুন। চার ভাই তিন বোনের মধ্যে দ্বিতীয় বা মেঝো সন্তান তিনি।

গওহরডাঙ্গা হাফেজিয়া মাদরাসায় পবিত্র কুরআন হিফজকরণের মাধ্যমে শুরু হয় শেখ আবদুল্লাহর শিক্ষা জীবন। এরপর একই মাদরাসায় কওমী শিক্ষা ধারায় পড়াশুনা করেন কিছুকাল। সুলতানশাহী কেকানিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা এবং সুলতানশাহী কেকানিয়া হাই স্কুল থেকে ১৯৬১ সালে মেট্রিক পাস করেন তিনি। এরপর খুলনার আযম খান কলেজ থেকে ১৯৬৩ সালে উচ্চ মাধ্যমিক, ১৯৬৬ সালে বিকম (অনার্স) ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭২ সালে এম.কম. এবং ১৯৭৪ সালে অর্থনীতিতে এম.এ ডিগ্রি অর্জন করেন শেখ আবদুল্লাহ। এরপর ১৯৭৭ সালে ঢাকা সেন্ট্রাল 'ল' কলেজ থেকে এলএলবি ডিগ্রী অর্জন করেন তিনি। এছাড়া ১৯৭৩ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন কিন্তু রাজনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দেশ সেবা করার লক্ষ্যে চাকুরির

পরিবর্তে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ গ্রহণ করে তার নেতৃত্বে রাজনীতি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সুলতানশাহী কেকানিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার মাধ্যমে তার কর্মজীবনের সূচনা হয়। পরবর্তীতে তিনি অ্যাডভোকেট হিসেবে গোপালগঞ্জ জজকোর্ট এবং ঢাকা জজকোর্টে প্র্যাকটিসও করেছেন দীর্ঘদিন। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালকের দায়িত্বও পালন করেন তিনি। এছাড়া বিভিন্ন শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করাসহ অসংখ্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা এবং পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ধর্মীয় ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছেন অ্যাডভোকেট শেখ মোহাম্মাদ আবদুল্লাহ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ ধারণ করে ছাত্রজীবনেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন শেখ মোহাম্মাদ আবদুল্লাহ। খুলনার আযম খান কমার্স কলেজের প্রথম ভিপি নির্বাচিত হন তিনি। ষাটের দশকে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানে চলমান ছয়দফা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন তিনি এবং বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে রাজনীতিতে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হন। এরপর যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মনির নেতৃত্বে তিনি আওয়ামী যুবলীগে যোগদান করেন। এরপর বঙ্গবন্ধুর সরাসরি তত্ত্বাবধানে গঠিত গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন এবং সুনাম ও সফলতার সঙ্গে এ দায়িত্ব পালনও করেন। কেন্দ্রীয় আওয়ামী যুবলীগের সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন শেখ মোহাম্মাদ আবদুল্লাহ। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান

আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে ভূমিকা পালন করাসহ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে স্থানীয় রাজনীতিতে জড়িত হয়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্ট মুজিব বাহিনীর সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত হন এবং বাঙ্গালী জাতির স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হলে সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তিনি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্নেহধন্য আদর্শ সৈনিক ছিলেন আলহাজ এডভোকেট শেখ মোহাম্মাদ আবদুল্লাহ। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বৃহত্তর খুলনা অঞ্চলে বিভিন্ন সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির ধর্মবিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন দীর্ঘদিন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অত্যন্ত আস্থাভাজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন শেখ মোহাম্মাদ আবদুল্লাহ। তার মৃত্যু পরবর্তীতে জাতীয় সংসদে শোক প্রস্তাব ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আবদুল্লাহ সাহেব ছিলেন আওয়ামী লীগের দুঃসময়ের কর্মী। দলের যে কোনো ক্রান্তিলগ্নে যে সব মানুষকে সবচেয়ে বেশি কাছে পেতাম তাদের অন্যতম ছিলেন তিনি। বঙ্গবন্ধুর একজন আদর্শ সৈনিক হারালো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।'

সদা হাস্যোজ্জ্বল এবং মিশুক সভাবের অধিকারী এ মানুষটি ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অত্যন্ত স্নেহধন্য এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ সহচর ও তার নির্বাচনী এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত আস্থাভাজন প্রতিনিধি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা তার নির্বাচনী সংসদীয় আসন ২১৭, গোপালগঞ্জ-০৩ এ যতবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, আলহাজ অ্যাডভোকেট শেখ মোহাম্মাদ আবদুল্লাহ তার পক্ষে নির্বাচনী এজেন্ট হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সব নির্বাচনী কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন এবং নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সংসদীয় প্রতিনিধি হিসেবে সততা, নিষ্ঠা ও সুনামের সঙ্গে নির্বাচনী এলাকা তত্ত্বাবধান করেছেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাত্রিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুসহ তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ ঘাতকের বুলেটের আঘাতে শাহাদাত বরণ করলে কঠিন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় দেশ। বিশেষ করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের জীবনে নেমে আসে দুর্দিন। এসময় গোপালগঞ্জ আওয়ামী লীগকে সংগঠিত রাখতে শেখ মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহ সকল লোভ-লালসা, ভয়-ভীতি, হুমকি-ধমকি উপেক্ষা করে অকুতোভয় সৈনিকের ভূমিকা নিয়ে আপসহীনভাবে দলের প্রতি অনুগত থেকেছেন এবং দলের নিবেদিত কর্মী-সমর্থকদের আস্থার প্রতীক হয়ে উঠেছেন। এমনকি ১৯৮০ সালে এরশাদ

সরকারের দেওয়ার মন্ত্রীত্বের অফারও প্রত্যাখান করেছেন তিনি। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল হয়ে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে দায়িত্ব পালন শুরু করেন অ্যাডভোকেট শেখ মোহাম্মাদ আবদুল্লাহ।

বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে আলহাজ অ্যাডভোকেট শেখ মোহাম্মাদ আবদুল্লাহ সৌদি আরব, কুয়েত, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। ধর্মপরায়ণ মুসলিম হিসেবে একাধিকবার পবিত্র হজব্রত ও উমরাহ পালন করেছেন তিনি।

বাধক্যজনিত শারীরিক অসুস্থতায় ২০২০ সালের ১৩ জুন রাত ১১.৪৫ মিনিটে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ইনতিকাল করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আলহাজ অ্যাডভোকেট শেখ মোহাম্মাদ আবদুল্লাহ। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বাংলাদেশের কোনো মন্ত্রী হিসেবে তিনিই প্রথম শহীদ হন। মহান প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে পাড়ি জমান পরকালে। জানাযার নামাজ শেষে গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে বাবা-মায়ের কবরের পাশে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয় তাকে।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং রাজনৈতিক সহকর্মীসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে চিরবিদায় নেন বাংলাদেশের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ধর্ম প্রতিমন্ত্রী। পাড়ি জমান না ফেরার দেশে। অ্যাডেভোকেট শেখ মোহাম্মাদ আবদুল্লাহ মৃত্যুতে রাজনৈতিক অঙ্গনে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এছাড়া দেশের প্রায় সব মত ও পথের শীর্ষস্থানীয় আলেম-উলামা ও পীর-মাশায়েখগণ শোক প্রকাশ করে তার রূহের মাগরিফাত কামনায় দোয়া-মোনাজাত করেছেন।

গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ এ সৈনিকের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। স্মরণীয় হয়ে থাকবে দ্বীন ইসলাম তথা মুসলিম সম্প্রদায় ও আলেম-উলামাবান্ধব তার অবদানগুলো। অ্যাডেভোকেট শেখ মোহাম্মাদ আবদুল্লাহ আজ আমাদের মাঝে নেই কিন্তু যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকবে তার চেতনা এবং তার আদর্শমাখা পথ-নির্দেশনা। চিরঞ্জীব হয়ে থাকবে তার অবদানমালা।♦

ক | বি | তা |

আজ কোন বাতি জ্বলছে না

শামসুল ফয়েজ

অদ্রির পড়ার শূন্য ঘরে বাতি জ্বলছে;
তার বাবা-মার ঘরে বাতি জ্বলছে;
বারান্দায় বাতি জ্বলছে;
উঠানের মাঝে জ্বলছে বড় বাতি।

অদ্রির নতুন ঘরে আজ রাতে কোন বাতি জ্বলবে না।
অদ্রির বাঁশ-চাটাইয়ের কাঁচা ঘরে আর
কোন রাতে কোন বাতিই জ্বলবে না।
যে মেয়েটি আলো ছাড়া একটি মুহূর্ত থাকতে পারতো না,
সে এখন অনন্ত নিদ্রায় শুয়ে আছে মাটির নতুন ঘরে।
যে মেয়েটি সামান্য বৃষ্টির ফোঁটায় আহত হতো,
সর্দিজ্বরে নিদারুন পেরেশান হতো,
তার নতুন বাড়িতে আজ বৃষ্টি ঝরছে অঝোর ধারায়।
সামান্য গুমোটে যে অস্থির হতো ফ্যান বন্ধ হলে,
সে আজ নিশ্চল হয়ে শুয়ে আছে দরজা-জ্বানালাহীন ঘরে।

প্রভু, তার অন্ধকার ঘরে ঢেলে দাও নূরের দরিয়া।

বেঁচে থাকি

মাহফুজ পারভেজ

'ইয়া রব, জমানা মুঝকো মিটাতা হ্যায় কিস লিয়ে লোহ?
এ জাহান পে হরফে মুকাররার নাহি হুঁ ম্যায়' - মির্জা গালিব

[হে খোদা, পৃথিবী কেন আমাকে মুছে ফেলতে চায়?
আমি এমন এক অক্ষর যা জীবনের শ্লেটে মুছে ফেলা যায় না।]

ঘরে বসে আছি পুরোটা বছর
আর জীবনের সকল সড়ক ঘিরে ফেলে আমাদের;
তবু আমি তোমাকে পারি না দিতে উপহার
কাছের উদ্যান কিংবা দূরের বালুকাবেলার পথ।

ছায়াসুনিবিড় পথগুলো ডাকে: আয় আয়–
হয় না যাওয়া প্রকৃতি ও মানুষের কাছে;
প্রান্তরের পর প্রান্তর প্রলোভনের হাতছানি দেয়
আমি-তুমি নিজ গৃহে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের বন্দিত্বে থাকি!

বাঁচি একাকী, সমাজ দূরত্বের বিচ্ছিন্নতার আবর্তে
মরে মরে বেঁচে থাকি ঘরে বসে পুরোটা বছর
আমি, তুমি, সবাই লকডাউনে জীবনকে করেছি সজ্জিত
একবিংশের দ্রুতগামী বিশ্বায়ন-গতির বিরুদ্ধে।

জীবনের ভ্রূণ মানিপ্ল্যানের শাখায় পাতায় পল্লবে
ঘরের বারান্দায় তৈরি করে জীবনের আচ্ছাদন
আমরা বেঁচে তো থাকি বিষাদের বৃত্তে অনন্ত আনন্দে
আস্ত একটি বছর: একাকী, বিচ্ছিন্ন ও তীব্র বিষাদে।

বেঁচে থাকি
মৃত্যুর উপত্যকায় জীবনের গান গেয়ে আর
আকাশের চেয়ে দূরে নিজস্ব বৃষ্টির
অন্তর্গত জলে ভিজে
দহন প্রহরে তাপে পুড়ে
নিঃসঙ্গতার শূন্যগর্ভ হাহাকারে:
বেঁচে থাকি।

জোছনার ফাঁদ

প্রত্যয় জসীম

আহা চাঁদ জানি তোর নেই কোন আলো
যুগে যুগে কবিমন তোকে বাসে ভালো।
দূরাকাশে হাসে মায়াবী পূর্ণিমা চাঁদ
কবিকে উতলা করে জোছনার ফাঁদ...।

অভিমানী মন বুঝে প্রেম কত দামী
অপমান অবহেলায় নতমুখে আমি...
ফিরে আসি বার বার কবিতার কাছে
বুঝিনা হয়তো তার মায়াজাল আছে।

মাঝে মাঝে মন বলে দূরে থাকা ভালো...
চাঁদটাতো দূরে থাকে কাছে থাকে আলো।
যত দূরে থাকো কবি মন থাকে মনে ...
ভালোবাসা মিছে মায়া কুহকী জীবনে...।

মায়াবী চোখের জলে

রনি অধিকারী

এই পথ মিশে যায় নদী জল অথৈ সমুদ্দুর
সূর্যালোকে জলস্তম্ভ যেন এক পাহাড় প্রাচীর।
প্রশ্নের শাসন ভাঙে অতঃপর ছুটে চলে ভয়
তবু ভয়ে বুক কাঁপে কেন যেন মানে না শাসন।
সব কিছু মনে হয় পড়ে আছে অজ্ঞাত আড়ালে
অচেনা বাতাস ছোঁয় সাঁই সাঁই শরীরের ভাঁজ...
মায়াবী চোখের জলে জন্ম নেয় অপলক নদী
জলকষ্ট জলমেয়ে আহারে নারীর নাম নদী।

ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন

জব্বার আল নাঈম

দিনের বেলা আমার চোখে ঘুম আসে না
রাতের বিছানায় যাই
নির্ভয়ে কপাট লাগিয়ে
শব্দগুলো থামিয়ে
সোডিয়াম বাতি নিভিয়ে
আয়াতুল কুরসি পাঠ শেষে বুকে ফুঁ দিয়ে

দিশেহারা হয়ে শার্ট-প্যান্টের পকেটে ঘুম খুঁজি
ওয়্যারড্রোব, টিভি, ফ্রিজ, ডাইনিং টেবিলের উপর খুঁজি
কাগজ-কলম ছুড়ে ফেলে কয়েক ঢোক পানি ঢকঢক গিলি
তবুও ঘুমহীন চোখ!

মোবাইল হাতে নিয়ে পরিচিতজনদের সঙ্গে
ফোনালাপ করি
এসএমএস পাঠাই
ভুলে সংবাদপত্র অফিসে ফোন দেই
রেডিওতে কান পাতি
পাশের ফ্ল্যাটের ভাবিদের জিজ্ঞেস করি–
বলতে পারে না ঘুমপিয়নের খবর!

এরপর মধ্যরাতের কম্বল সরিয়ে
শূন্যের মধ্যে দৌড় দেই
দেখি মায়ের ফোন
কান্নাভেজা কণ্ঠ...
তোমার বাবার কবরঘুম হয়েছে
সকালে বাড়ি এসো!

ফিলিস্তিন

আরাফাত রিলকে

এখানে রক্তের নদী ও সভ্যতা হাত ধরাধরি করে চলে,
এখানের দেয়ালে বিগত আগত মানুষের হাহাকার।
এখানের ক্যানভাসে রক্তের রঙ,
এখানের মাটি ও আকাশে রক্তের উড়ে যাওয়া।

এখানে বিমূঢ় বিশ্ব সভ্যতা,
এখানে বিমূঢ় সব পরাশক্তি।
এখানে কোনো জাতিসংঘ নেই,
এখানে মোড়লদের প্রলাপ বিলাপ নেই।

এখানে অচল যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য,
অচল মানবতা, ঘুণে ধরা মানবাধিকার।
এখানে অচল বাগাড়ম্বরে শুয়ে থাকা কিট,
পথে পথে বিছানো বেহুদা ফুলের সম্ভার।

এখানে কান পাতলে আমি কানে শুনি না,
এখানে চোখ রাখলে আমি কিছুই দেখি না।
আমার ভেতর অজস্র কান্নার আওয়াজ ওঠে,
ফিলিস্তিন বলতেই আমার ঠোঁট পুড়ে যায়।

আষাঢ়ের কবিতা

শেখ দুলাল

কী আশ্চর্য বাজনা বাজে আষাঢ় মাস নব-নব জোয়ার ডাকে;
ভাসমান কালো মেঘ উড়ে বেড়ায় আকাশের বাঁকে।
ঘনঘোর বরিষা জমজমাট সাজে–
ঈষৎ বাতাস থেমে যায় বিষ্টি নামে মহারাজে।
গড়গড় নৈঃশব্দ প্রবল বিষ্টির ধারা,
সমতল ভূমি ইশারাতেই দেয় দৃঢ় সাড়া।
সাত-সমুদ্রের মতো বেয়ে আনে,
প্রবল স্রোত গতি-ঝরনার মিষ্টি স্বর-গানে।
সোনালি-রূপালি ছোট-বড়ো মাছগুলো,
নেচে-নেচে সাঁতার কাটে বেড়ায় হুলোথুলো।
কিচিরমিচির ছেলে-মেয়েরা মাছ ধরে,
আনন্দ-ফুর্তিতে নেচে ওঠে নদী যায় ভরে।
কতো জেলেদের সাড়া পড়ে যায়,
একসুত্রে গাঁথা সবুজের গাঁয়।
আকাশ ডাকে গুড়োগুড়ো নৈঃশব্দ,
মাঠ-ঘাট থৈ-থৈ ভরপুর অব্দ।
ছোট্ট-ছোট্ট নৌকা-ডিংগী,
ভেসে বেড়ায় রুই-কাতলা চিংড়ি,
পুব আকাশে ভেসে ওঠে রংধনুর ছায়া,
সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা কেটে হাসে গোধূলির সাঁঝের মায়া।

বাংলা ভাষা ও প্রকৃতি চেতনা

আবদুস সালাম খান পাঠান

বাংলা ভাষার সুখ খুঁজি আমি স্বাধীন মনে, প্রগাঢ় বন্ধনে
কথন-বচন, লিখন প্রাণোচ্ছল আবহে মধুর ছন্দ শব্দ-ব্যঞ্জনায়।
আধুনিক বাংলা শব্দে; ভালোবাসা, দেশপ্রেম কবিতার
ভাবনা রূপক উপমায়, অনেক ঐশ্বর্য, পদাবলী প্রাচীনচর্যায়,
তাপিত প্রাণ জুড়ায়।

প্রাচীন পুঁথি লালন গীতি মরমী সুরধারায়, বাংলা অভিধান,
সাহিত্য সমৃদ্ধ নব জাগরণ আধুনিকতায়।
কথ্য ভাষায় বাংলার লোকগাঁথা প্রেমের আলেখ্য
দেওয়ানা মদিনা, মহুয়া মলুয়া গীতিকথা বন্দনা
রোমান্টিক চেতনায় ময়মনসিংহ গীতিকা।
মহাকাব্য, সনেট, অমিত্রাক্ষর ছন্দ; বাংলা ভাষার গৌরব
সাহিত্য-ভাণ্ডারে– যুগে যুগে অত্যুজ্জ্বল সৌরভ।
সাগরে প্রবাল ভাসে এই জোয়ার ভাটায়, জীবনের
গতি, ঝর্ণার- স্রোতধারায়। মনের আকাঙ্ক্ষা
লেখনী কখনো থেমে না যায়, মায়ের ভাষায়।
ঝাউবন আড়ালে প্রকৃতি শোভায় বসন্ত হাসে–
পদ্মাচর সাদা কাঁশবনে ফুলেল শুভেচ্ছায়।
গোধূলি-সন্ধ্যায় সাগরে সূর্যাস্ত কিরণ
লালচে আভায় অজস্র ভালোবাসা রয় বাংলার সবুজ শ্যামলিমায়।
কত সৌন্দর্যে, নুড়ি, পাথর, ঝিনুকের
স্তূপ জমে, বঙ্গোপ সৈকতে আর্দ্র বালুকায়

উপকূলে, ঐ আকাশের মেঘমালা, উড়ে যায়, হিমালয় বরফ চূড়ায়।
নানান জাতির আদি-ভাষা যেনো পৃথিবী
থেকে হারিয়ে না যায়, একান্ত বাসনা,
হৃদয়ের অর্ঘ্য পুষ্প ছড়িয়ে জনম ভরে
প্রমিত ভাষা বাংলা, শব্দের ঝংকারে -উচ্চারণ-প্রাচুর্যে।
কতো আখ্যান লুকিয়ে রয় বিরিশিরি, কংশ নদীর বাঁকে, নয়ন শুধু ছবি আঁকে।
অনেক উচ্ছাস-প্রাণাবেগ, ছড়িয়েছে ফাগুনের রজনী প্রহরে।
ভাষা শহীদের গভীর শ্রদ্ধা
বিনম্র ভালোবাসা উজাড় এই আটই ফাল্গুনেরই উষা প্রহরে।

একহাত অগ্রগামী

আহমেদ আববাস

বহুকাল আগের কথা।

তৎকালীন খোরাসান দেশের ঘটনা। একসময় তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান ও ইরানের কিয়দংশ এবং সমগ্র আফগানিস্তান খোরাসানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে-সময় খোরাসানের নিশাপুর ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ নগরী। ব্যবসা-বাণিজ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্মচিন্তা-ধর্মতত্ত্ব, শিক্ষা-সংস্কৃতি, চারুকলা, স্থাপত্য শিল্প সবদিক থেকে বিকশিত। অবশ্য নিশাপুর বর্তমানে ইরানের অভ্যন্তরে। নিশাপুর থেকে আঠারো মাইল পূর্ব দক্ষিণে একটি অখ্যাত ক্ষুদ্র অঞ্চলের নাম শাহপুর। এখানে সপ্তাহে দু'বার হাট বসে। এ অঞ্চলে একজন ক্ষুদ্র সামন্ত নরপতি বাস করেন। যার হাঁকডাক অখ্যাত এলাকার চাইতে

বেশি প্রসারিত। খানে খানান শাহ কুতুব খান। নাম শুনে ভয়ে কাঁপতে থাকে শাসিত প্রজা সাধারণ।

ভারতবর্ষ থেকে বৃহত্তর খোরাসানের ভেতর দিয়ে যে পথটা ক্রমাগত আরব দেশের দিকে অগ্রসরমান। সেই পথের পাশেই শাহপুর। সৃষ্টির শুরুর দিকে আদি মানব বাবা আদম ভারতবর্ষ থেকে কাবাগৃহ তাওয়াফের জন্যে হয়তোবা এই পথেই হাজারবার আরব দেশে গমন করেছেন। ভারতবর্ষ এবং মধ্য এশিয়ার অনেক দেশের কাফেলাই এই পথে যাতায়াত করে।

ফিরোজ পাশার নব পরিণীতা স্ত্রী শিরিন বানু আসন্ন শীতের আশঙ্কায় একদিন বললো, 'ঘরের কম্বল দুটো ছিঁড়ে গেছে। শীত থেকে বাঁচতে হলে শিগগির কম্বল কিনতে হবে। আমার পোষাক-আশাকের কথা না-হয় বাদ দিলাম কিন্তু সংসারে একটা ভালো বাসনপত্র পর্যন্ত নেই।' 'বড় কোনো কাজের আদেশ না পেলে হয়তো এখনই কোনো কম্বল কেনা সম্ভব নয়', নৈর্ব্যক্তিকভাবে ফিরোজ পাশা জানায়। 'নিজে অন্যায় অপকর্ম করে ভাইবোনসহ পুরো পরিবারের ভার মাথায় তুলে নিছো। অথচ নিজের জন্য কিছুই করোনি। নিজের জন্যেও তো কিছু ভাবতে হবে।'

স্ত্রীর শেষকথায় আচমকা ধাক্কা খেয়ে ফিরোজ পাশা ঘর থেকে বের হয়ে পড়ে। তৎকালিন খোরাসানের নসরাবাদ অঞ্চলের সামন্ত নরপতি শাহ কুতুব ফিরোজ পাশাকে দেখেই উল্লাসের সাথে বলেন, 'হ্যা বীরোত্তম তোমার কথাই ভাবছিলাম। কেমন আছো। না ডাকলে তো আজকাল দরবারে আসাই হয় না। যাক ভালোই হয়েছে। জরুরি একটা কাজ করতে হবে তোমাকে।'

'আদেশ করুন জাহাপনা।'

'লুতফাবাদ অঞ্চলের লোকজন এবার খাজনা দিতে নানা টালবাহানা করছে। গত বছর খরায় নাকি ভালো ফসল পায়নি। আর তাদের দলবদ্ধ করে নেতৃত্ব দিচ্ছে একজন সাহসী তরুণ।' 'আপনি চাইলে সেই যুবকের মাথা এখনই আপনার সামনে হাজির করতে পারি।'

রাজার ইশারা পাওয়ামাত্র ছুটে চলে ফিরোজ পাশা। যেমন ইঙ্গিত, তেমন সঙ্গীত। একজন উদীয়মান প্রতিবাদী যুবকের অকালপ্রয়াণ। প্রজাদের কাছে রাজার পাওনা আদায়ে আর কোনো বাধা থাকে না। ভবিষ্যতে নিশ্চিত উদরশূন্য থাকতে হবে জেনেও প্রজারা জানের ভয়ে জমিদারের ধার্যকৃত কর পরিশোধ করতে বাধ্য হয়।

ফিরোজ পাশার ভাগ্যে জোটে একশত স্বর্ণমুদ্রা। পেয়ে যায় স্ত্রী তার বায়নাকৃত কম্বল, রেশমি চুড়ি এবং জরিদার পোষাক। আর সাময়িক স্বাচ্ছন্দ্য। ফিরোজ পাশা, পাশা ফিরোজ। রাজা বলেন, বীরোত্তম ফিরোজ। কেউ বলে

জল্লাদ, কেউ বলে খুনি, কেউ বলে দস্যু। সেই সামন্ত জমিদারের নিকট নন্দিত হলেও সবার কাছেই সে নিন্দিত। এমনকি প্রিয়তমা স্ত্রীসহ পরিবারের অন্যান্য স্বজন তার কৃতকর্মকে মেনে নিলেও মনে মনে অপছন্দ করে।

ফিরোজ পাশা প্রাথমিকভাবে মানুষ হত্যার কার্যক্রম শুরু করে সেই সামন্ত নরপতির ইঙ্গিতের মাধ্যমেই। পরবর্তীতে জীবননাশ করতে গিয়ে মনে হয়েছে, এক খুনের জন্য যে দণ্ড, দশ খুন করলেও সেই একই শাস্তি। তারপর অর্থের প্রয়োজনে। কিংবা স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটলেই অবলীলাক্রমে দুনিয়া থেকে পথের কাটা সরিয়ে ফেলতে দ্বিধাবোধ করেনি। এভাবে নরবধ তার একটা নেশায় পরিণত হয়। কখনো ডাকাতির ছলে, কখনোবা গৃহের অদূরবর্তী অপসৃয়মান মহাসড়কে পথচারী কাফেলায় দস্যুবৃত্তির ছলে।

একসময় অযৌক্তিক মনুষ্য জীবনহানির তালিকা দ্বিতীয় অংকের বৃহত্তম সংখ্যায় গিয়ে ঠেকে। বনের ধারে শিকারের জন্যে অপেক্ষমাণ ফিরোজপাশা নরবধের সংখ্যা গুনতে গুনতে গৃহিনীর চিমটি কাটা পীড়াদায়ক কথাটি মনে পড়ে যায়। আচানক তার বোধোদয় হয়। একটু অনুশোচনা জাগে। আমি কী করছি! কোথায় করছি! কার জন্যে করছি, কেন করছি। আমার অপরিণামদর্শিতার কারণে তো কত মাতাপিতা পুত্রশোকে পাগল। কত বোন তার ভাইয়ের আদর থেকে বঞ্চিত। কত অবুঝ শিশু পিতার স্নেহ-যত্ন থেকে বঞ্চিত হয়ে অকালে ঝরে পড়ছে। কত স্ত্রীকে স্বামীর ব্যবধানে যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়ে নিরাশায় বৈধব্যবরণ করতে হচ্ছে। এসব কথা ভাবতে ভাবতে দ্রুত ঘরে ফেরে ফিরোজ পাশা। জিজ্ঞেস করে স্ত্রীকে এবং অন্যান্য স্বজনকে 'আমার অন্যায়ের এবং এ পাপের দায়ভার তোমরা কি নেবে?' 'আমরা তো তোমাকে বলিনা, কোনো অন্যায় বা পাপকাজ করতে। আমরা চাই তুমি উপার্জন করো।' সবার কাছ থেকে একই উত্তর পাওয়া যায়

সকলের সমার্থক প্রত্যুত্তরে তার চেতনা ফিরে আসে। তৎক্ষণাৎ সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। দিগ্বিদিকশূন্যভাবে পথে ছুটতে থাকে। সামনে একজন আগন্তুক ভদ্রলোককে পেয়ে জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা ভাই এই এলাকায় কি কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি আছেন?' একজন জ্ঞান-প্রবরের নাম বলে পথ বাৎলে দেন পথচারি ভদ্রলোক। হাঁটতে হাঁটতে নির্দেশিত দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

তারপর কাঙ্খিত জ্ঞানী ব্যক্তির সন্ধান মেলে। আশান্বিত হয়ে প্রশ্ন করে, 'জনাব, আপনার কাছে এসেছি এক বিশাল সমস্যা নিয়ে। এ পৃথিবীতে আমি অনর্থকভাবে ৯৯ জন ব্যক্তির জীবননাশ করেছি। আমার কি কোনো মুক্তির পথ আছে?' জ্ঞানী ব্যক্তিটি জানায়, 'তুমি খুনি, বিশ্বখুনি। ধারাবাহিক ঘাতক। তোমার কোনো মুক্তি নেই।'

‘মুক্তিই যদি না থাকে, তাহলে পাপের ভয় কেন? এমন জ্ঞানের নিকুচি করি।’ এই বলে অত্যন্ত হতাশ হয়ে একটানে কোমরে রক্ষিত কোষবদ্ধ তরবারি বের করে ফেলে। নিঃশঙ্কচিত্তে সেঞ্চুরি পূরণ করে।

আশাভঙ্গ হয়ে বিফল মনোরথে পুনরায় গৃহের বিপরীত দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হতে থাকে। এমন সময় হঠাৎ পথে এক বুজুর্গ ব্যাক্তিকে দেখে কী ভেবে আশা-নিরাশার দোলাচলে থেকে যথাযথ সালাম জ্ঞাপনপূর্বক তাকে জিজ্ঞেস করে, ‘হে সম্মানিত ব্যক্তি, আমি আমার এ ক্ষুদ্র জীবনে বিশাল পাপের বোঝা বহন করে চলেছি। আমি একশত মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করেছি। আমি সৎপথে ফিরে যেতে চাই। মুক্তি পেতে চাই।’

‘তোমার পাপ ও মুক্তির মাঝে কে বাধা হতে পারে! অবশ্যই তুমি মুক্তি পাবে। সৃষ্টিকর্তা কাউকে বিমুখ করেন না। এ স্থান ভালো নয়। এখানে থাকলে আবার তোমার ভুল হতে পারে। আমার পরামর্শ হলো, এখান থেকে তুমি সোজা নিশাপুর চলে যাও। সেখানে গেলে দেখবে একটা বিশাল ধর্মীয় পীঠস্থান। যার একাংশে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ধর্মচর্চা নিয়ে গবেষণারত, অন্যাংশে আগ্রহী শিক্ষানবিশগণ জ্ঞান অণ্বেষণরত এবং অপারাংশে কিছু ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তার ধ্যানজ্ঞান এবং ক্ষমা প্রার্থনায় মশগুল। তুমি অবশ্যই শেষোক্ত স্থানে যাবে। সেখানে গিয়ে সবার সাথে সৃষ্টিকর্তার গুনগান এবং ক্ষমাপ্রার্থনা কর। তুমি সন্দেহাতীতভাবে ক্ষমাকৃতদের অন্তর্ভুক্ত হবে।’

‘ধন্যবাদ সম্মানিত ব্যক্তি। আপনার উপর সৃষ্টিকর্তার করুণা বর্ষিত হোক।’

কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন শেষে ফিরোজ পাশা জোরকদমে নিশাপুর অভিমুখে চলতে থাকে। সত্যপথ প্রাপ্তির প্রত্যাশায়। ক্ষমা মার্জনা পাবার অভিপ্রায়ে। অন্তরের গহীনে আশার আলো জ্বলে ওঠে তার। ক'দিন ধরে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে আশা-নিরাশার দোলাচলে থেকে শারীরিকভাবে অনেকটাই ভেঙ্গে পড়েছিল তার। তবু সৎপথে ফিরে যাবার প্রত্যয়ে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ত্বরিতপদে এগোতে থাকে সে। দ্রুত পথ চলতে চলতে একসময়ে ক্লান্তিতে পা অবসন্ন হয়ে পড়ে তার। তবু মনের ভেতর যে প্রদীপ জ্বলে উঠেছে তা দমন করা কার দুঃসাধ্য! প্রায় ন'মাইল পথ পাড়ি দিয়ে সে একবারে নিশ্চল ও নিস্পন্দ হয়ে পড়ে। দুর্বলতা ও শক্তিহীনতায় আচানক মাটিতে পড়ে যায় সে। অল্পক্ষণের ভেতরে তার প্রাণবায়ু নির্গত হবার উপক্রম হয়। ভাবে, আর বুঝি নিশাপুর যাওয়া হলো না। আর বুঝি মুক্তিপ্রাপ্তি কপালে জুটলো না। তারপরও শুয়ে বুকে হামাগুড়ি দিয়ে এবং ক্রলিং করে সামনে অগ্রসর হতে থাকে। একসময় সত্যি সত্যি হাত-পা অবশ হয়ে পড়ে এবং ক্রমশ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

ফিরোজ পাশা মারা যাবার পর তার বিদেহি আত্মা সংগ্রহ করার জন্যে আকাশ থেকে দুজন স্বর্গীয় দূত নেমে আসেন। শান্তির দূত বলেন, 'ভালো হবার প্রত্যাশায় সংসার স্বজন সবকিছু ফেলে কৃতকর্মের অপরাধে হৃদয়ের গভীরে তার যে ভাবান্তর সৃষ্টি হয়েছে, যেভাবে সে কল্যাণের পথে, করুণাপ্রার্থী হবার জন্যে, এতদূর ছুটে এসেছে তাতে সে স্বর্গেই যাবে।'

অপরদিকে দণ্ডদানের দূত বলেন, 'সে সারাজীবন পাপাচারে কাটিয়েছে, শত প্রাণহানি ঘটিয়েছে, সুতরাং নরকের শাস্তি তার অনিবার্য প্রাপ্য। এ সাজা থেকে তার মুক্তি নেই।'

দুজনের ভেতরে যুক্তিতর্ক চলতে থাকে। ইতোমধ্যে সেখানে অন্য আরেকজন স্বর্গীয়দূত বুজুর্গবেশে উপস্থিত হন এবং উভয়ের যুক্তি পরামর্শ মনোযোগ সহকারে শোনেন। শেষে বলেন, 'আপনাদের উভয়ের আপত্তি না থাকলে আমি মধ্যস্থতাকারী হিসেবে একটি সমাধান দিতে চাই। গ্রহণযোগ্য হলে মেনে নেবেন।'

যুক্তিপূর্ণ এ কথায় উভয়ে রাজি হয়ে যান। এ সময় ছদ্মবেশধারী বুযুর্গ বলেন, 'আপনাদের উভয়ের কথাই যুক্তিপূর্ণ এবং উভয়েই সঠিক। তবু এর একটা সমাধান হওয়া আবশ্যক।'

এরপর তিনি আবার বলেন, 'বাস্তবিক পক্ষে লোকটি ছিল সিরিয়াল কিলার। সে পাপ বা অন্যায় করেছে সত্য। আবার সে হৃদয়ের মর্মপীড়ায়, করুণা প্রার্থনার মানসে পুণ্যত্মা ব্যক্তিদের সাহচর্য লাভের প্রত্যাশায় মনের আবেগে সৃষ্টিকর্তার কৃপা কামনার পথে অগ্রসরমান ছিল। সুতরাং এক্ষণে এর সমাধান একটাই পাপিষ্ট ব্যক্তিটি প্রকৃত বুযুর্গ ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণের পর যেখানে তার মনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন আসে, সে-স্থান থেকে তার মৃতদেহ পর্যন্ত যে দূরত্ব এবং নিষ্প্রাণ দেহ থেকে নিশাপুরের ধর্মীয় পীঠস্থান পর্যন্ত দূরত্ব যদি সমানও হয়, তবু তার আত্মা শান্তি পাবার যোগ্য। তাকে ভালো হবার উদ্যমে অবশ্যই অর্ধেকেরও বেশি পথ পাড়ি দিতে হবে। কেননা সে ভয়ংকর অপরাধী।'

এ কথায় দণ্ডদানের দূত খুশি হন। শান্তির দূতের মন একটু খারাপ হলেও যৌক্তিক বিষয়টি মেনে নেন। তারপর তিনজন একসাথে উভয়দিকে পরিমাপের মানদণ্ড মাপকাঠির মাধ্যমে মাপা শুরু করেন। একবার, দুবার, তিনবার মাপেন। প্রত্যেকবারই দেখা যায়, প্রাণহীন দেহ থেকে নিশাপুরের পীঠস্থান পর্যন্ত একহাত দূরত্ব কম। অর্থাৎ করুণা প্রার্থনার দিকে একহাত অগ্রগামী। পূর্বে উভয়ের গ্রহণকৃত সিদ্ধান্তের সমাধান মোতাবেক স্বর্গের দূত ফিরোজ পাশার বিদেহী আত্মা গ্রহণ করে।

পুনশ্চ : পবিত্র মুসলিম শরীফের একটি হাদীস (হাদীস নং- ২৪৫৮) এর ছায়া অবলম্বনে।♦

ইব্রাহিম খাঁ

মুহম্মদ মতিউর রহমান

ইংরেজি শিক্ষা-সভ্যতা-সাহিত্যের প্রভাবে বাঙালি হিন্দু সমাজে ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনা-লগ্নে নবজাগরণের উন্মেষ ঘটে। বাঙালি মুসলিম সমাজে এ

নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটে এর প্রায় অর্ধশতাব্দি কাল পরে। মূলত ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহ তথা সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থতাবরণের পর উপমহাদেশের মুসলিমগণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের পথ পরিহার করে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের চেষ্টা করে। ১৮৬৩ সালে কলকাতায় 'মোহামেডান লিটার‍্যারি সোসাইটি' গঠিত হয়। এরপর ভারতীয় মুসলিমগণ ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হন। ফলে বাঙালি মুসলিম সমাজে ধীরে ধীরে নবজাগরণ ঘটে। এক্ষেত্রে দানবীর হাজী মোহাম্মদ মহসীন, স্যার সৈয়দ আহমদ (১৮১৭-৯৮), নবাব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-৯৩), স্যার সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) প্রমুখের অসামান্য অবদান রয়েছে। এ নবজাগরণের অন্যতম ফসল প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহিম খাঁ (জন্ম : ২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪, মৃত্যু : ২৯ মার্চ ১৯৭৮)।

ইব্রাহিম খাঁ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী– একাধারে প্রবন্ধকার, নাট্যকার, গদ্য-লেখক, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ ও সমাজ-সংস্কারক হিসাবে সুপরিচিত। তিনি টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলার বিরামদী গ্রামে এক মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শাহবাজ খাঁ এবং মাতার নাম রতন খানম। তিনি ১৯১২ সালে পিংনা হাইস্কুল থেকে এন্ট্রান্স, ১৯১৪ সালে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ থেকে এফ.এ, ১৯১৬ সালে কলকাতা সেন্ট পলস কলেজ থেকে ইংরেজিতে বি.এ অনার্স ও ১৯১৯ সালে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ পাশ করেন।

উচ্চশিক্ষা লাভের পর তিনি প্রথমে টাঙ্গাইলের করটিয়া ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯২০ সালে তিনি ভারতীয় কংগ্রেস পার্টিতে যোগ দেন। অতঃপর তিনি অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনে (১৯২০-২২) সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। এ সময় তাঁর চেষ্টায় করটিয়া ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয় জাতীয় বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। ১৯২৪ সালে তিনি আইন বিষয়ে ডিগ্রি লাভ করে শিক্ষকতা পেশা পরিত্যাগ করে ময়মনসিংহ জজকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। ঐ সময় তিনি ময়মনসিংহে 'আল হেলাল সাহিত্য সমিতি' গঠন করে তরুণদেরকে সাহিত্য চর্চায় উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস পান। উক্ত সমিতি স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম-বিষয়ক রচনা আহ্বান করে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে তিনটি ভাল রচনার জন্য পুরস্কার প্রদান করতো। এর উদ্দেশ্য ছিল বাংলা সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারার প্রবর্তন ও তরুণ সাহিত্যিক সৃষ্টিতে প্রেরণা দান। (দ্র. "বিবিধ প্রসঙ্গ", 'সাম্যবাদী', ৩য় বর্ষ-২য় সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৩১, পৃ. ৬)।

ওকালতি পেশায় সততা বজায় রাখা কঠিন বলে তিনি দু'বছর পর আইন

ব্যবসা পরিত্যাগ করে ১৯২৬ সালে করটিয়ার জমিদার দানবীর ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর অর্থ সাহায্যে করটিয়া সা'দত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত কলেজে তিনি প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন। তৎকালিন যুক্ত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মুসলিমদের মধ্যে তিনিই প্রথম কলেজের 'প্রিন্সিপ্যাল' পদ অলংকৃত করেন। পরবর্তীতে উক্ত কলেজ তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা ও দক্ষ পরিচালনায় তদানীন্তন যুক্ত বাংলায় এক ঐতিহ্যবাহী নামকরা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। একসময় উক্ত কলেজ 'বাংলার আলীগড়' হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। শিক্ষাব্রতী হিসাবে তাঁর অবদান সম্পর্কে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গবেষক ডক্টর সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন:

"বাংলার উচ্চ শিক্ষাব্রতী মুসলমান সমাজে তিনি ছিলেন এক অনুপ্রেরণা স্বরূপ। তাঁর প্রেরণা ও উৎসাহে অন্ধকারের পর্দা ছিঁড়ে ফেলে শিক্ষার আলোতে ছুটে আসতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে এ কালের বহু মুসলমান। তাই তাদের চেতনায় প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ অমরত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। মুসলিম সমাজে সকলের আগে প্রিন্সিপাল হয়ে যে অসাধ্য তিনি সাধন করেছেন তার জন্য দেশবাসী 'প্রিন্সিপাল' শব্দটি অতিশ্রদ্ধাভরে তাঁর নামের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন।"

১৯৩৭ সালে ইব্রাহিম খাঁ কংগ্রেস পরিত্যাগ করে ভারতীয় মুসলিমদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগে যোগ দেন। ঐ বছর তিনি অবিভক্ত বাংলার আইন পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে পরাজিত হন। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের অধিবেশনে শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক উত্থাপিত 'লাহোর প্রস্তাব' পাশের পর উপমহাদেশে মুসলিমদের স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জোরদার হয়। প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ এ আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি মুসলিম লীগের টিকিটে মধুপুর-গোপালপুর কেন্দ্র থেকে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। এ সময় তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী করটিয়া সা'দত কলেজের অধ্যক্ষ পদে সুদীর্ঘ ২২ বছর দায়িত্ব পালনের পর অবসর গ্রহণ করেন। এরপর তিনি প্রাদেশিক প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি (১৯৪৭-৭১) ও ১৯৪৮-৫২ পর্যন্ত তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তান মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি পাকিস্তান গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু পরবর্তী বছর ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যুক্তফ্রন্টের নিকট পরাজিত হন। ১৯৫৭ সালে তিনি আওয়ামী লীগে যোগ দেন। ১৯৬২ সালে মৌলিক গণতন্ত্র প্রথার অধীনে ময়মনসিংহ ২ আসন থেকে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতাসীন কনভেনশন মুসলিম লীগে যোগ দেন। ১৯৭০ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে মুসলিম লীগের (কাইয়ুমপন্থী) মনোনয়নে

টাঙ্গাইল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন। বিভিন্ন সময় তিনি পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসাবে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সভা-সম্মেলনে যোগদান করেন। এ উপলক্ষে তিনি তুরস্ক, মিশর, লেবানন, সৌদি আরব, সিরিয়া, ইরান, চীন ইত্যাদি দেশ পরিভ্রমণ করেন।

আজীবন শিক্ষাব্রতী হিসাবে প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ বাঙালি মুসলিম সমাজে শিক্ষার আলো জ্বালাতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ইব্রাহিম খাঁ উচ্চ শিক্ষা লাভ করে আজীবন শিক্ষাদান কাজে নিরত থাকেন। পাঠ্য বই রচনা ও শিক্ষামূলক নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও গ্রন্থাদি রচনা করেন। বিভিন্ন স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারে অসামান্য অবদান রাখেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভুয়াপুর হাইস্কুল, ভুয়াপুর বালিকা বিদ্যালয়, ভুয়াপুর কলেজ, করটিয়া জুনিয়র গার্লস মাদ্রাসা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। দেশ ও জাতির খেদমত করা ছিল তাঁর রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম, অমায়িক, বিনয়ী ও সজ্জন ব্যক্তি। নিষ্ঠাবান মুসলিম হিসাবে মুসলিম সমাজের উন্নতিকল্পে সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করা সত্ত্বেও তিনি মনে-প্রাণে ছিলেন একজন অসাম্প্রদায়িক উদার ব্যক্তি।

বহুবিধ কাজের মধ্যে ইব্রাহিম খাঁর প্রধান পরিচয় ছিল একজন দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ ও প্রথিতযশা লেখক হিসাবে। এক্ষেত্রে তাঁর অবদান অসামান্য। লেখক হিসাবে তিনি একাধারে প্রবন্ধ, নাটক, ছোটগল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী, স্মৃতিকথা ও শিশুতোষ গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের তালিকা–

নাটক : কামাল পাশা (১৩৩৪), আনোয়ার পাশা (১৩৩৭), ঋণ পরিশোধ (১৯৫৫), ভিস্তি বাদশা (১৯৫৭), কাফেলা।

উপন্যাস : বৌ বেগম (১৯৫৮)।

গল্পগ্রন্থ : আলু বোখরা (১৯৬০), উস্তাদ (১৯৬৭), দাদুর আসর (১৯৭১), মানুষ, হিরকহার।

স্মৃতিকথা : বাতায়ন (১৩৭৪)।

ভ্রমণ কাহিনী : ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র (১৯৫৪), নয়া চীনে এক চক্কর, পাকিস্তানের পথে-ঘাটে।

শিশু সাহিত্য : ব্যাঘ্র মামা (১৯৫১), শিয়াল পণ্ডিত (১৯৫২), নিজাম ডাকাত (১৯৫০), বেদুঈনদের দেশে (১৯৫৬), ইতিহাসের আগের মানুষ (১৯৬১), গল্পে ফজলুল হক (১৯৭৭), ছোটদের মহানবী, ছেলেদের শাহনামা,

ছোটদের নজরুল, গুলবাগিচা, নবী জীবনের ঝাণ্ডা বহিল যারা, তুর্কী উপকথা, নীল হরিণ, সোহরাব রোস্তম ইত্যাদি।

ধর্ম-বিষয়ক: মহানবী মুহাম্মদ, ইসলামের মর্মকথা, ইসলাম সোপান, ছোটদের মিলাদুন্নবী।

শিক্ষা-বিষয়ক: আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, সংস্কৃতির মর্মকথা, নীতিকাহিনী।

ইব্রাহিম খাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা মোট ১১৮টি। এরমধ্যে ১৮টি অনুবাদ গ্রন্থ, ইংরাজিতে লেখা গ্রন্থ-সংখ্যা ১২ এবং বাংলা ভাষায় রচিত মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যা মোট ৮৮টি। ইংরেজিতে লেখা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'এনেকডোটস ফ্রম ইসলাম' একটি মূল্যবান গ্রন্থ। এটি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

শিক্ষাবিদ, সমাজ-সংস্কারক, রাজনীতিবিদ ও লেখক ইব্রাহিম খাঁর একটি সাধারণ পরিচয় হলো তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে একজন সমাজ-সচেতন, জনদরদী, মানব কল্যাণকামী ও সর্বোপরি অধঃপতিত মুসলিম সমাজের নবজাগরণে বিশ্বাসী এক মহৎ প্রাণের উদার মানুষ। তাঁর সাহিত্যে সর্বত্র এ বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁর সাহিত্যের ভাষা সহজ, সরল ও সকল শ্রেণির মানুষের নিকট বোধগম্য। তাঁর সাহিত্যের বিষয় ও বিভিন্ন চরিত্রও পরিচিত সমাজ ও পরিপার্শ্ব জগত থেকে সংগৃহীত। সাধারণ মানুষের জীবন-চিত্র তিনি অতিশয় আন্তরিকতার সাথে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ও অনাচার-কুসংস্কারের বিষয় তিনি তুলে ধরেছেন, মূলত সেগুলোর যুক্তিযুক্ত সমাধান বাতলে দেয়ার জন্য। অধঃপতিত-বঞ্চিত মুসলিম সমাজের উন্নতিকল্পে তিনি নবজাগরণের প্রেরণায় তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছেন। সাহিত্য-সাধনা তাঁর নিকট কোন পেশা বা নেশা ছিল না, সমাজের প্রতি অসীম দায়বদ্ধতা থেকে তিনি সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর একটি উক্তি স্মরণযোগ্য। তাঁর লেখা এক পত্রে তিনি বলেন:

"আমার কর্মজীবনের এক বিশাল এক অংশ আমি সাহিত্য সেবায় যাপন করেছি। সাহিত্য সাধনা আমার বিলাস ছিল না, এ ছিল আমার জীবনের অন্যতম তপস্যা। এ তপস্যার মারফত আমি তন্দ্রাহত জাতিকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। আমার সে আহ্বানে সমাজের সকল মানুষের নিন্দ্রা ভঙ্গ হয় নাই সত্য, তবে অনেকে মোচড় দিয়ে অর্ধজাগ্রত হয়েছে, আর কতক পূর্ণ জাগ্রত হয়ে উঠে বসেছে। আমার এই ক্ষুদ্র সাফল্যকে আমি আমার জীবনের অন্যতম সার্থকতা বলে মনে করি।...."

ইব্রাহিম খাঁর সাহিত্যের ভাষা সহজ, সরল ও সকলের বোধগম্য এবং তাঁর সাহিত্যে সমাজ ও মানুষের জীবনের অন্তরঙ্গ চিত্র ফুটে উঠেছে। সাহিত্যকে তিনি

সমাজ উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। সমাজের কল্যাণ ও মানুষের মধ্যে সত্যিকার মানবিকবোধের উন্মেষ ঘটানোই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য। এ ক্ষেত্রে ইব্রাহিম খাঁর দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত বাস্তবধর্মী। তিনি মনে করেন, সাহিত্য মানুষের জন্য–সাধারণ মানুষ যাতে সাহিত্য পাঠে আগ্রহী হয় এবং সহজে সাহিত্য রস আস্বাদন করতে সক্ষম হয়, সেদিকে দৃষ্টি রেখেই সাহিত্য রচিত হওয়া উচিত। এ সম্পর্কে তিনি ১৯৬৮ সালে সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত এক সাহিত্য সম্মেলনে বলেন:

"একটি হরফ জ্ঞান নেই এমন লাখ লাখ লোক নয়, কোটি কোটি লোক বাংলার পুঁথিপুঞ্জ থেকে পেয়ে আসছে সাহিত্যের রস, চিত্তের আনন্দ, প্রাণের খোরাক। আমরা জনগণের সাহিত্য জনগণের জন্য ফিরিয়ে দিতে চাই, পুঁথি সাহিত্য চাই না, আমরা চাই সহজ-সুন্দর ভাষায় লিখিত জনগণের উপযোগী ভাষা। অকারণে হরফের জুলুম অকারণে বানানের জুলুম এ আমরা বরদাশত করতে চাই না।"

ইব্রাহিম খাঁর রচিত নাটক ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিষয় নিয়ে লেখা। তাঁর রচিত 'কামাল পাশা' ও 'আনোয়ার পাশা' নাটকে তুরস্কের নবজন্মের কথা বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে বাংলার মুসলিম সমাজে নবজাগরণের প্রেরণা সৃষ্টি করাই তাঁর মূল্য লক্ষ্য। তাঁর রচিত 'ঋণ পরিশোধ', 'ভিস্তি বাদশা', 'কাফেলা' প্রভৃতি নাটক সামাজিক বিষয় নিয়ে লেখা। এসব নাটকে আমাদের সমাজে যে সব সমস্যা, অনাচার ও কুসংস্কার বিরাজমান তার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। লেখক সে সব সমস্যার সমাধানও বাতলে দিয়েছেন, সামাজিক অনাচার ও কুসংস্কার দূরীকরণার্থে তিনি নাটকের পাত্র-পাত্রীর সংলাপ, ঘটনা ও আখ্যানের বিন্যাস ঘটিয়েছেন। তাঁর রচিত সামাজিক নাটকের বিষয়বস্তু, চরিত্র ইত্যাদি সবকিছুই চলমান সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন থেকে সংগৃহীত। নাটকের বিভিন্ন ঘটনা, সংলাপ ও চরিত্রের বর্ণনায় লেখক অত্যন্ত সহজ, সরল, অনেক ক্ষেত্রে হাস্যতরল ও ব্যঙ্গাত্মক ভাষা ও ভঙ্গী ব্যবহার করেছেন। উপন্যাস ও গল্প রচনায় তিনি সমাজের বিভিন্ন বিষয় ও জীবনের বিচিত্র দিক তুলে ধরেছেন। এখানেও সমাজসেবা ও সমাজ-সংস্কারই তাঁর মূল লক্ষ্য। তাঁর গল্প-উপন্যাসের ভাষা সহজ, সরল ও রসঘন। তাঁর গল্প বলার আয়েশী ভঙ্গি সকলকে মুগ্ধ করে। তাই সকল শ্রেণির পাঠকের নিকট তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন।

ছোটদের জন্য তিনি বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। এগুলো অধিকাংশই পাঠ্য-পুস্তক হিসাবে রচিত। বিশেষত শিশু-কিশোরদের ভাল ভাল কথা, উপদেশ ও শিক্ষার মাধ্যমে তাদের চরিত্র গঠন ও সাহসী মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার

উদ্দেশ্যে তিনি এ সকল গ্রন্থ রচনায় সচেষ্ট হন। শিশু-কিশোরদের উপযোগী গ্রন্থে শিশু-কিশোর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে সহজ, সরল ভঙ্গীতে হাস্য-কৌতুকের মাধ্যমে তিনি অনায়াসে তাদের উপযোগী মনোগ্রাহী গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলা শিশু-সাহিত্য শাখায় তাঁর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর শিক্ষা বিষয়ক রচনায় শিক্ষাবিদ ইব্রাহিম খাঁর চিন্তা-চেতনা, আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার গলদ ও তা নিরসনের উপায়-নিরূপণ সম্পর্কে তিনি মূল্যবান পরামর্শ দান করেছেন।

ইসলাম বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থে তিনি ইসলামের মূল আদর্শ ও শিক্ষা সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন। শিক্ষিত সমাজ বিশেষত তরুণদেরকে ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান দানের উদ্দেশ্যে তিনি এসকল গ্রন্থ রচনা করেন।

ভ্রমণ কাহিনীমূলক রচনায় তিনি পৃথিবীর যে সব দেশ সফর করেছেন, তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে সে সব দেশের ভৌগোলিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক নানা বিষয় রসঘন ও চিত্তাকর্ষকভাবে তুলে ধরেছেন। এসব গ্রন্থ পাঠে বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নানা বিষয় অবগত হওয়া যায়। তাঁর স্মৃতিকথামূলক রচনা 'বাতায়নে' জীবনের ব্যাপক অভিজ্ঞতার অন্তরঙ্গ বর্ণনা স্থান পেয়েছে। এটি তাঁর সমকালিন জীবনের এক অবিস্মরণীয় গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

বাঙালি মুসলিম নবজাগরণের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্রান্তিলগ্নে ইব্রাহিম খাঁর আবির্ভাব। দীর্ঘকাল ইংরেজের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থেকে এবং একাধারে ইংরেজি ও সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজের জুলুম-নির্যাতন ও বঞ্চনার শিকার হয়ে বাঙালি মুসলিমগণ অধঃপতনের চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। উনবিংশ শতকের শেষার্ধে অধঃপতিত ও আত্মসম্মিতহারা মুসলিম জাতির মধ্যে নবজাগরণের প্রেরণা সৃষ্টি হয়। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে নবজাগরণের এ চেতনা তাদেরকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যপথে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা যোগায়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিমদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীন রাষ্ট্রের বুনিয়াদ সঠিক ভিত্তির উপর গড়ে তোলার জন্য তিনি রাজনীতি, সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

ইসলামের প্রতি অনুরাগ, মুসলিমদের প্রতি দরদ ও মুসলিম সমাজের উন্নয়নে ইব্রাহিম খাঁর কত গভীর আগ্রহ ছিল এবং এ জন্য তিনি কতটা আন্তরিকতা সহকারে চিন্তা-ভাবনা করতেন, কাজী নজরুল ইসলামকে লেখা তাঁর একটি চিঠি থেকে তা সুস্পষ্ট হয়। উক্ত চিঠি ১৩৩৪ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'নওরোজ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আমাদের সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি চিন্তার ক্ষেত্রে উক্ত চিঠির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করে এখানে তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হলো:

"তোমাকে কখনো দেখি নাই। অনেকবার দেখা করার সুযোগ খুঁজেছি, সে সুযোগও ঘটে নাই– দূর হতে শুধু তোমার লেখা পড়েছি, মুগ্ধ হয়েছি, অন্তরের অন্তঃস্থল হতে ঐ প্রতিভার কাছে বার বার মস্তক নত করেছি। বলেছি– 'প্রভু, এ কাঙ্গাল বাঙ্গালী মুসলিম সমাজকে একটি রত্ন দিয়েছ, একে রক্ষা করো– সমাজকে দিয়ে ওর কদর করিয়ে নাও।'... বাঙলার মুসলমান সমাজ কাঙ্গাল : শুধু ধনে নয়, মনেও। তাই বাঙলার অ-মুসলমানরা তোমায় যে কদর করছেন, মুসলিমরা তা করেন নাই, করতে শেখেন নাই।... কে সে সুধার পাত্র হাতে নিয়ে এই মরণোন্মুখ সমাজের সামনে দাঁড়াবে? কোন্ সুসন্তান আপন তপোবনে গঙ্গা আনয়ন করে এ অগণ্য সগরগোষ্ঠীকে পুনঃ জীবনদান করবে, কাঙ্গাল সমাজ উৎকণ্ঠিতচিত্তে করুণ নয়নে সেই প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে। কেন জানি না; কিন্তু মনে হয় তোমায় বুঝি খোদা সে সুধা ভাণ্ডের কিঞ্চিত দান করেছেন, অন্তরের অন্তরালে বুঝি সে সাধনার বীজ জমা আছে। হাত বাড়াবে কি? একবার সাহসে বুক বেঁধে সে তপশ্চারণে মনোনিবেশ করবে কি?...তুমি সেই কবিদের একজন; তোমার কণ্ঠে সেই সঞ্জীবনী সুধার উন্মাদনা আছে।...তোমার কাছে আমরা চাই বাবরের অভিযান, সে অভিযানের দক্ষিণে-বামে অগ্রে-পশ্চাতে নব নব সৃষ্টির সৌধ বাঙলার মুসলিমরা তোমার কদর করে নাই; কিন্তু তাই কি তাদেরে তুমি ছেড়ে যাবে? তোমার ক্ষেত্র মুসলিম-সাহিত্য। বাঙ্গালী মুসলিম চেয়ে আছে তোমার কণ্ঠ দিয়ে ইসলামের প্রাণবাণীর পুনঃ প্রতিধ্বনি এই নিদ্রিত সমাজকে মহা আহ্বানে জাগ্রত করবে। বাঙলার আর দশজন কবির মত যদি তুমি কবিতা লেখ, তবে তোমার প্রতিভা আছে, স্থায়ী আসন তুমি পাবে, কিন্তু সে আসন আসন মাত্র, সিংহাসন নয়। আজ বাঙলার মুসলমান-সাহিত্য রাজ্যে সিংহাসন খালি পড়ে রয়েছে, তুমি শুধু দখল করলেই হয়।... তুমি বাঙ্গালী কবি, তুমি মুসলমান।... যিনি বাঙলার সাহিত্যে ইসলামের সত্য সনাতন নিষ্কলঙ্ক চিত্র দান করবেন, যিনি 'এইসব ভগ্ন শুষ্ক শ্রান্ত বুকে আশা ধ্বনিয়ে তুলবেন, যিনি ইসলামের সত্যস্বরূপ দেশের সম্মুখে ধরে মুসলিমের বুকে বল দিবেন, অমুসলিমের বুক হতে ইসলামের অশ্রদ্ধা দূর করতে হিন্দু-মুসলমান মিলনের সত্য ভিত্তির পত্তন করবেন, তিনি হবেন বাঙ্গালী মুসলিমের মুক্তির অগ্রদূত।' তুমি চেষ্টা করলে তাই হতে পার; তুমি সেই মহাগৌরবের আসন দখল করতে পার; তুমি এইরূপে তোমার কবি প্রতিভাকে, তোমার জীবনকে, তোমার মানবতাকে সহজতমরূপে সার্থক করতে পার।...ইসলাম আধুনিকতার উন্নততম ধর্ম, তবে যা বাঙলার মুসলিমরা অনেক কুসংস্কারে পড়েছে, সে ইসলামের দোষ নয়, এই হতভাগারা ইসলামের সাথে ঐ কুসংস্কারগুলি পোষণ করছে।... 'তোমার বিদ্রোহী' পড়ে যাঁরা বিদ্রোহী হয়েছিলেন, তাঁদের একজন তোমার

'ছুবহে উম্মিদ' পড়ে আনন্দে গর্বে লাফিয়ে উঠেছিলেন, আর নাচতে নাচতে এসে আমায় বলেছিলেন, 'নজরুল যদি এমনি ধারায় লিখত তবে বাঙলার আলিমরা যে তাকে মাথায় করে রাখত' [যিনি বলেছিলেন, তিনি একজন আলীম]। একথা কয়টা তোমায় ভেবে দেখতে বলি। বাঙলার মৌলানা রুমীর আসন খালি পড়ে রয়েছে, তুমি তাই দখল করে ধন্য হও, বাঙলার মুসলিমকে বাঙলার সাহিত্যকে ধন্য কর।

"তাই আজ বড় আশায়, বড় ভরসায়, বড় সাহসে, বড় মিনতির স্বরে তোমায় বলছি, ভাই কাঙ্গাল মুসলিমের বড় আদরের ধন তুমি, তুমি এই পতিত মুসলিম সমাজের দিকে, এই অবহেলিত ইসলামের দিকে একবার চাও; তাদের ব্যথিত চিত্তের করুণ রাগিণী তোমার কণ্ঠে ভাষা লাভ করে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলুক, তাদের সুপ্ত প্রাণের জড়তা তোমার আকুল আহ্বানের উন্মাদনায় চেতনাময়ী হোক, ইসলামের মহান উদার আদর্শ তোমার কবিতায় মূর্তি লাভ করুক, তোমার কাব্য সাধনা ইসলামের মহান নীতিতে চরম সার্থকতায় ধন্য হোক। আমিন।..."

নজরুলের নিকট লেখা ইব্রাহিম খাঁর উপরোক্ত পত্রটি থেকে ইসলামের প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠা ও মুসলিম সমাজের উন্নয়নে গভীর আগ্রহ ও উদ্বেগের বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। নজরুল ৩ বছর পর এক দীর্ঘ পত্রের জবাব দিয়েছিলেন। সে পত্রটি নানা দিক থেকে ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্যবহ। নজরুল জীবনের নানা দিক, না বলা দুঃখ-বেদনা ও চিন্তা-চেতনার বিষয় তাতে বর্ণিত হয়েছে।

ইব্রাহিম খাঁ তাঁর অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বিভিন্ন সময় নানা খেতাব ও পুরস্কার পেয়েছেন। বৃটিশ সরকার তাঁকে প্রথমে 'খান সাহেব' ও পরে 'খান বাহাদুর' উপাধি প্রদান করে। খান সাহেব উপাধি তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন এবং খান বাহাদুর খেতাব তিনি পরবর্তীতে বৃটিশ সরকারের মুসলিম-বিরোধী মনোভাবের প্রতিবাদে প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৬৩ সালে পাকিস্তান সরকার তাঁকে 'তঘমা-এ-কায়দে আযম' খেতাব প্রদান করেন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংসতার প্রতিবাদে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৭৩ সালে তিনি নাটকে বাংলা একাডেমী পুরস্কার ও ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'একুশে পদক' লাভ করেন। ১৯৭৭ সালে তিনি ভুয়াপুর 'সাহিত্য সংসদ' গঠন করে একুশে পদকের সব অর্থ ও কিছু জমি উক্ত সাহিত্য সংসদে দান করেন। মুসলিম নবজাগরণ, শিক্ষা-সমাজকল্যাণ ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ইব্রাহিম খাঁ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।♦

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে আমাদের ভাবনা

মঈনুল হক চৌধুরী

পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পরিবেশের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। মানুষসহ সব প্রাণের অস্তিত্ব পরিবেশের উপরই নির্ভরশীল। কারণ পরিবেশই প্রাণের ধারক ও বাহক। ফলে পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশের সঠিক ব্যবহার ও সংকটাপন্ন পরিস্থিতির কথা সামনে

রেখেই প্রতি বছর সারাবিশ্বে ৫ জুনকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। জাতিসংঘ মানব পরিবেশের সুরক্ষা ও উন্নতিকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক কর্মোদ্যোগ আর জনসচেতনতার মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে দিনটি পালিত হয়। ১৯৭২ সালে জাতিসংঘে পরিবেশবাদের উন্নয়নে সুইডেনের স্টকহোমে ৫-১৬ জুন প্রথম পরিবেশ বান্ধব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পরিবেশ সংরক্ষণ ও বর্ধিতকরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার একটি মৌলিক সাধারণ দৃষ্টিকোণ গঠন করাই ছিল এর লক্ষ্য। এ সম্মেলনকে স্টকহোম সম্মেলনও বলা হয়। একই বছর ১৫ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ৫জুনকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ঘোষণা করে এবং UNEP (United Nations Environment Programme) নামে পরিবেশবাদী একটি সংস্থা তৈরি করে। ১৯৭৪ সালের ৫ জুন প্রথম বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হওয়ার পর থেকে ১শ'টির বেশি দেশে দিবসটি পালনের মধ্য দিয়ে একটি বিশ্বব্যাপী পরিবেশবাদী প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে। দিবসটি সামুদ্রিক দূষণ, মরুকরণ, ওজোন স্তর, মাটি দূষণ, বিশ্বের উষ্ণতা হ্রাস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে গঠিত একটি বৃহৎ পদক্ষেপ। তাই প্রতিবছর একটি বিশেষ প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে দিবসটি পালিত হয়। যা পরিবেশগত সমস্যার প্রতি মানুষের মনোযোগ সৃষ্টি করে। মানুষ প্রকৃতির একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। প্রকৃতির অন্য উপাদানগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় না থাকলে মানুষের পক্ষেও সম্ভব না সুস্থ ও সুন্দরভাবে এই সুন্দর পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকা। অথচ আমরা এই সত্যকে উপেক্ষা করে বিশ্বব্যাপী এগিয়ে চলেছি পরিবেশ বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডে। মেতে উঠেছি ধ্বংসের খেলায়। আর তাই তো বাধ্য হয়ে প্রকৃতিকেই এগিয়ে আসতে হলো আমাদের এ তথাকথিত অগ্রযাত্রা থামাতে। যে অগ্রযাত্রায় নিয়মিত উজাড় হচ্ছে হাজার হাজার মাইল বনভূমি, পুড়ছে আমাজন, ধুঁকছে প্রাণীর ফুসফুস, গলছে উত্তর-দক্ষিণের বরফ, বাড়ছে সমুদ্রের লোনা পানি, বিষাক্ত হয়ে উঠছে বাতাস। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর চীনের উহানে ছড়িয়ে পড়েছিল এক প্রাণঘাতী ভাইরাস করোনা। সেই ভাইরাসের কারণে পুরো বিশ্ব আতঙ্কিত ছিল। এখনো আছে। এ বছরের মার্চ মাস থেকে এ পর্যন্ত করোনাভাইরাস আবারও আমাদের দেশসহ সারা বিশ্বের অনেক মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। এই ভাইরাসের আক্রমণে এখনো পৃথিবীর দেশে দেশে মানুষের মৃত্যু অব্যাহত রয়েছে। আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত অসংখ্য মানুষ এই করোনা ভাইরাসের আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছে।

উল্লেখ্য, করোনার শুরুতে করোনার কারণে সেই সময় সারাবিশ্ব দাপিয়ে বেড়ানো মানুষ চার দেয়ালে বন্দি হয়ে পড়েছিল। অসহায় মানুষ তখন জানতে

পারেনি, কবে কাটবে তাদের বন্দিদশা। যদিও এই অদৃশ্য দানব করোনার সাথে যুদ্ধ করে মাস্ক পরে ও সামাজিক দূরত্ব মেনে সারাবিশ্বের মানুষ এখন জীবন জীবিকার কাজে বেরিয়ে পড়েছে ঘর থেকে। সেই সময় সারাবিশ্বের মানুষ জানতো না মৃত্যুর সংখ্যা ঠিক কত পেরুলে তবে শান্ত হবে এ ভাইরাসটি। তবে আশার কথা সম্প্রতি করোনা ভাইরাসের টিকা আবিষ্কার ও তার প্রয়োগের ফলে বিশ্বব্যাপী মানুষের মৃত্যুহার যেমন কমে এসেছে তেমনি মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে শুরু হয়েছে।

করোনার শুরুতে প্রথম পাঁচ থেকে ছয় মাস সারাবিশ্বের মানুষকে চার দেয়ালে বন্দি করে ফেলে প্রকৃতি। মুক্ত করে দিয়েছিল তার বুকে বেঁচে থাকা অন্যান্য প্রাণীদের। ফলে ২০২০ সালে অন্যান্য বছরের তুলনায় বিশ্বে দূষণের পরিমাণ কমে ছিল প্রায় ৫০ শতাংশ। বায়ুস্তরে কার্বন মনোক্সাইডের পরিমাণ নেমে এসেছিল অর্ধেকে। সে বছরই মার্চে গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণের পরিমাণ যা রেকর্ড করা হয়েছে, তা ১৯৯০ সালের গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণের সমান। দূষণের শহর ঢাকায় যেখানে শব্দের মাত্রা থাকে প্রায় ১১০-১২০ ডেসিবল, সেটা চলে এসেছিল মানুষের শ্রবণসীমার মধ্যে। পৃথিবীর সর্বাধিক বায়ু দূষণের দেশগুলোর তালিকায় বিগত কয়েক বছর ধরে শীর্ষে স্থান করে নেয়া ঢাকা এখন ২৩ নম্বরে বলে জানিয়েছে বায়ু নিয়ে গবেষণাকারী সংস্থা 'এয়ার ভিজ্যুয়াল'। উল্লেখ্য, তারপরও মহামারি করোনাসহ বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সমস্যা ও তার বিরূপ প্রভাব ক্রমশ মানব জাতি এখনও শংকিত। উন্নত বিশ্বে এসব সমস্যা উন্নয়নশীল দেশের সমস্যার তুলনায় ভিন্নতর এবং ভিন্নমাত্রার। সমস্যার এই ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও সমগ্র মানব জাতির অস্তিত্বের প্রতিই পরিবেশ সমস্যা হুমকি স্বরূপ। কোনো কোনো দেশ কর্তৃক সৃষ্ট দূষণ সে দেশের ভৌগলিক

সীমারেখার মধ্যে সীমিত নাও থাকতে পারে, তা সমগ্র ভূমণ্ডল ছড়াতে পারে এবং বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। সেই পৃথিবীর শুরু থেকেই মানুষ সব সময়ই কোনো না কোনো ভাবে পরিবেশ দূষিত করে আসছে। আর এই পরিবেশ দূষণের ফলেই বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের শুরু। উল্লেখ্য ১৮ শতকের শিল্প বিপ্লব ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে মানুষের কর্মকান্ড তার চারপাশের পরিবেশকে দূষিত করে চলেছে, যেমন– কলকারখানার ধোঁয়া, ইটের ভাটা থেকে নির্গত ধোঁয়া, যানবাহনের কালো ধোঁয়া ইত্যাদি। এছাড়াও দ্রুত নগরায়নের জন্য নির্বিচারে গাছ কাটার ফলে বায়ুমণ্ডলের কার্বনডাই অক্সাইড এর পরিমাণ বেড়ে গেছে ভীষণ। এভাবেই মানুষের কারণে বায়ুমণ্ডলে তাপবৃদ্ধিকারক গ্যাস এর পরিমাণ ভীষণভাবে বেড়ে যাওয়াতে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে অস্বাভাবিক ভাবে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে আমাদের দুই মেরুতে যে বিপুল পরিমাণের বরফ জমে আছে তা গলতে শুরু করেছে। বরফগলা অতিরিক্ত পানি এসে পড়ছে সাগরে। ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে গেছে। এছাড়া তাপমাত্রা বাড়ার কারণে বাস্পীভবনের মাত্রা বেড়ে বৃষ্টিপাতের হার বেড়েছে বহুগুন। উল্লেখ্য, জলবায়ু পরিবর্তন আজ এক স্বীকৃত সত্য, বাস্তব ঘটনা। উষ্ণতা বাড়ার কারণে পৃথিবীতে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের হার বাড়ছে। ফলে তৃতীয় বিশ্ব ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির ছোট ছোট দরিদ্র দেশগুলোও মারাত্মক হুমকির মুখে পড়ছে। ইউনিসেফের হিসেব মতে, বিশ্বের প্রায় ৫৩ কোটি শিশু মাত্রাতিরিক্ত বন্যাপ্রবণ এলাকায় বাস করে। এর মধ্যে ৩০ কোটি শিশু বাস করে এমন দেশগুলোতে, যেখানকার অর্ধেক বা তারও বেশি মানুষ দরিদ্র। এছাড়া প্রায় ১৬ কোটি শিশুর বাস অত্যাধিক খরা প্রবণ অঞ্চলে। আর ১৫কোটি শিশুর বাস এমন সব এলাকায়, যেগুলোতে সাইক্লোনের প্রবণতা রয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগামী ১৫ বছরে বিশ্বের আরো প্রায় ১০ কোটি মানুষকে দারিদ্রের দিকে ঠেলে দিতে পারে জলবায়ু পরিবর্তন।

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জাতিসংঘ সমর্থিত আন্তসরকার সংস্থা ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জের (আইপিসিসি) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে এই শতকে বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে ০.৩ থেকে ৪.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শিল্প কারখানা যেখানে বেশি, সেখানে গড়ে ০.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে। ২১০০ সাল নাগাদ সাগরে পানির উচ্চতা বাড়বে ২৬ থেকে ২৮ সেন্টিমিটার। বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা যদি এক থেকে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যায়, তবে ঝুঁকির পরিমাণও সেই অনুপাতে বাড়বে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে বিশ্বের কোনো মানুষই রেহাই পাবে না। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের আবহাওয়া দপ্তর বলেছে, পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা এরই মধ্যে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (ডাব্লিউএমও) বলেছে বায়ুমন্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসই আবহাওয়ামণ্ডলের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এর ফলে বাড়ছে সমুদ্রেপৃষ্ঠের উচ্চতা। বাড়ছে খরা, ঝড়-বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যেসব শহর, হুমকির মুখে তার মধ্যে রয়েছে ভেনিস, ঢাকা, মিয়ামি, নিউইয়র্ক, ব্যাংকক, হংকং, হো চি মিন, টোকিও, মুম্বাই ইত্যাদি। তাছাড়া জলবায়ুর প্রভাবে গত চার দশকে সামুদ্রিক প্রাণীদের সংখ্যা কমে অর্ধেক হয়েছে। উল্লেখ্য, বিজ্ঞানীদের ধারণা, গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনের ফলে জলবায়ু পবির্তন ঘটছে ব্যাপকভাবে। যেসব দেশ গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনকারী হিসেবে পরিচিত তারা হল- চীন, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ভারত, রাশিয়া, জাপান। বিগত ২৫ বছরে দ্রুত উন্নয়নশীল চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত পরিণত হয়েছে প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ সর্বোচ্চ গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনকারী দেশে। ১৯৯২সালে বলা হয়েছিল, বিশ্বের ধনী রাষ্ট্রগুলোই পরিবেশের ক্ষতি করেছে। আর এ সমস্যা সমাধানের জন্য তাদেরই বেশি পদক্ষেপ নেয়া উচিত। ১৯৯৭ সালে প্রণয়ন করা কিয়োটো প্রটোকলে বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত হয়েছিল। ২০০৫ সাল থেকে কার্যকরী হওয়া কিয়োটো প্রটোকলে বলা হয়েছিল, শুধু শিল্পোন্নত দেশগুলোই গ্যাস নির্গমনের মাত্রা কমাবে। যদিও সেসময়ের শীর্ষ নির্গমনকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্র এতে স্বাক্ষর করেনি। তবে গ্রীনহাউস গ্যাস নির্মগমনকারী শীর্ষ দেশগুলো এরই মধ্যে তাদের কর্মপরিকল্পনা জমা দিয়েছে জাতিসংঘে। জাতিসংঘের মানদণ্ড অনুযায়ী, প্রাক শিল্পায়ন যুগের সাপেক্ষে বৈশ্বিক উষ্ণতা কোনোভাবেই দুই ডিগ্রী সেলসিয়াসের ওপরে নিয়ে যাওয়া যাবে না তবে বিশ্বের গরীব ও নিচু স্থানে থাকা ছোট দ্বীপরাষ্ট্রগুলো (যারা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রথম ও প্রত্যক্ষ শিকার হবে) বলেছে, দুই ডিগ্রির যথেষ্ট নয়। যেতে হবে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। উষ্ণতা বৃদ্ধি দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত গেলেও পৃথিবীতে অনেক খরা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনে

কোনোভাবেই দায়ী না হয়েও জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার হওয়া কিংবা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঝুঁকির মুখে থাকা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ আছে প্রথম সারিতে। আমরা জানি, ভূ-প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের এক অনন্য সমন্বয় আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। নদী বিধৌত এই বিস্তৃত সমতল মূলত : দক্ষিণের সমুদ্র হতে উদ্ভুত এক বিশাল বদ্বীপ। আবার এর উত্তর ও পশ্চিমে অবস্থিত সুউচ্চ পর্বতসমূহের কারণে ঐ এলাকার ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে বেশ উঁচুতে অবস্থিত। ভূমি বৈচিত্র্য ও ভৌগলিক অবস্থানগত পার্থক্যের কারণে সামগ্রিক পৃথিবীর জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব বাংলাদেশে একেক অঞ্চলে একেক রকম পরিলক্ষিত হয়। তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বিশেষ করে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনভূমি সুন্দরবনের স্থল ও জলভাগের লবণাক্ততা বৃদ্ধিসহ নানারূপ ক্ষতিসাধন হচ্ছে এবং এরই প্রভাব হিসেবে সমগ্র দেশের পরিবেশ ভারসাম্য হারাচ্ছে। শুধু সুন্দরবনেই না, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দক্ষিণের বঙ্গোপসাগরসহ সমগ্র দেশ জুড়েই বিশেষ করে হাওড়, বাওড়, ও নদীগুলোতে জীববৈচিত্র্যের ব্যাপক বিলুপ্তি ঘটছে ও পরিবেশ ভারসাম্য হারাচ্ছে।

পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধিও প্রভাবে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল প্রায় প্রতিবছরই খরা ও মঙ্গা কবলিত হয়। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে হিমালয়চুড়ায় বরফ গলছে আর অন্যদিকে আমাদের নদীগুলো অতিরিক্ত পলি জমার কারণে নাব্যতা হারাচ্ছে,

এই দুইটি কারণে বন্যা ও নদী ভাঙন উত্তরের জেলাগুলোর জন্য আবশ্যিক দুর্যোগ হয়। এছাড়াও শীতকালে উত্তরাঞ্চলসহ সারাদেশেই অতিরিক্ত শৈত্য প্রবাহ এবং ঘন কুয়াশা বাড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে জলোচ্ছাস ও সাইক্লোনের মাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে গেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঋতুচক্রে অস্বাভাবিত পরিবর্তন এসেছে। ফলে ফসলের ফলনকালেরও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। এমন অনেক ফসল আছে যা পরিবর্তিত জলবায়ুর কারণে অথবা জলবায়ু পরিবর্তনের নানা প্রভাব যেমন জলাবদ্ধতা বা পানির ঘাটতির কারণে এখন আর চাষ করা যায় না। চাষাবাদের সময়কাল ও দীর্ঘদিনের ধারায় আকস্মিক ও ঘনঘন পরিবর্তন সমগ্র দেশের প্রয়োজনীয় কৃষি উৎপাদনকে ব্যাহত করে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে মানুষ, পশুপাখি, উদ্ভিদ ও নানা ফসলের নতুন নতুন রোগ ও মহামারির প্রাদুর্ভাব দেখা দিচ্ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এরই প্রভাবে নিচু এলাকা ডুবে যাচ্ছে। একই কারণে বাংলাদেশ তার বিস্তৃত সমুদ্রতট যা পৃথিবীর বিস্তৃততম তট ও এক অনন্য পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃত তা হারাতে বসেছে। এছাড়াও সমুদ্রের ছোট ছোট দ্বীপগুলো সেখানকার জীবজগৎ ও জনবসতির অস্তিত্ব নিয়ে হুমকির সম্মুক্ষীন। বাংলাদেশের তিনটি ভিন্ন উপকুলীয় অঞ্চলে প্রতিবছর সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে ৬-২০ মিলিমিটার করে। এর মধ্যে গঙ্গা অববাহিকায় উচ্চতা বাড়ছে বছরে ৭-৮ মিলিমিটার, মেঘনা অববাহিকায় ৬-৯ মিলিমিটার ও চট্টগ্রামের উপকুলীয় অঞ্চলে ১১-২০ মিলিমিটার। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের একটি বড় অংশ পানির নীচে চলে যেতে পারে বলে অনেক আগে থেকেই বলে আসছেন বিজ্ঞানীরা। উল্লেখ্য, ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে গত ২০১৫ সালের ৩০ নভেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বর, জাতিসংঘের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল জলবায়ু বিষয়ক ২১তম শীর্ষ সম্মেলন। দ্য কনফারেন্স অব পার্টিস (কপ-২১) নামের এই সম্মেলন। সম্মেলন শেষ হওয়ার কথা ছিল ১১ডিসেম্বর। মতৈক্য না আসায় সময় একদিন বাড়ানো হয়। অবশেষে ১২ ডিসেম্বর রাতে চুক্তিতে সম্মতি দিয়েছে বিশ্বের ১৯৫টি দেশ। পৃথিবীর তাপমাত্র বর্তমানের চেয়ে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সম্মত হয়েছেন তারা। ছয় বছর আগে কোপেনহেগেনে ও বিশ্বজলবায়ু সম্মেলন যা পারেনি, প্যারিস সম্মেলন তা নিশ্চিত করেছে। এখন দৃষ্টি উষ্ণায়ন দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে রাখা। উল্লেখ্য, নিউইয়র্কের জাতিসংঘ সদর দফতরে গত ২০১৬ সালের ২২ এপ্রিল ১৭৫টি দেশের সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান এবং তাদের প্রতিনিধিরা প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন।

এর ফলে বিশ্বকে রক্ষা করার যে সম্মিলিত প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল প্যারিস জলবায়ু সম্মেলনে তা অর্থবহ রূপ ধারণ করল। আমরা আশা করব শুধু স্বাক্ষরদান নয়, চুক্তি বাস্তবায়নেও সব দেশের সদিচ্ছার প্রতিফলন ঘটবে। জলবায়ুর পরিবর্তন বিশ্ববাসীর জন্য মূর্তমান সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। এ পরিবর্তনে সাগর তীরবর্তী বেশ কিছু দেশ অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে, তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। স্বভাবতই জলবায়ুসংক্রান্ত যে কোনো চুক্তিকে বাংলাদেশের অস্তিত্বের স্বার্থেই গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হবে এমনটিই স্বাভাবিক। বিশ্বের জলবায়ুর অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটছে গ্রিন হাউস অ্যাফেক্টের কারণে। শিল্পোন্নত দেশগুলোর কারণে দূষণের শিকার হচ্ছে আবহাওয়া। আবহাওয়ায় উষ্ণতার আগ্রাসনে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর বরফ গলছে। বাড়ছে সাগরের উচ্চতা। ফলে সাগর তীরবর্তী নিচু দেশগুলোর অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। এ ভয়াবহ বিপদের মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার দুটি দেশ। যথা– বাংলাদেশ ও মালদ্বীপ।

বাংলাদেশের সাগর কূলবর্তী বিভিন্ন এলাকা দীর্ঘদিন যাবৎ আবহাওয়ার পরিবর্তনজনিত অবস্থার শিকার। এসব এলাকার হাজার হাজার হেক্টর জমি লোনা পানির নিচে ডুবে আছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে। গ্রিনহাউস নিঃসরণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বিশ্ব। সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে লবণাক্ত পানি ঢুকে পড়ছে লোকালয়ে। একদিকে নদী ভাঙন, অন্যদিকে মরুকরণের ফলে বাড়ছে জলবায়ু উদ্বাস্তু। উল্লেখ্য, পরিবেশ সুস্থ, সুন্দর ও

পরিচ্ছন্ন রাখতে রয়েছে ইসলামের নির্দেশনা রয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'তোমরা নিজেদের ধ্বংস নিজেরা ডেকে এনো না।' (সূরা বাকারা : ১৯৫) অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'মানুষের কৃতকর্মের দরুন সমুদ্র ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে।' -সূরা আর রুম : ৪১।

পরিবেশ দূষণ থেকে বাঁচতে হলে পরিচ্ছন্নতা অপরিহার্য। পবিত্র কুরআনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা সম্পর্কে অনেকবার বলা হয়েছে। বলা হচ্ছে, 'আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরও।'-সূরা বাকারা : ২২২। আল্লাহতা'য়ালা পৃথিবীতে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা জীবজগতের অস্তিত্ব রক্ষায় বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কুরআনে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, 'আমি বিস্তৃত করেছি ভূমিকে ও তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা এবং উৎপন্ন করেছি নয়নাভিরাম বিবিধ উদ্ভিদরাজি। এটি আল্লাহর অনুরাগী বান্দাদের জন্য জ্ঞান ও উপদেশস্বরূপ।'- সূরা কাফ : ৭-৮। সমগ্র সৃষ্টি জগতের কল্যাণের জন্য আল্লাহপাক পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেছেন। ভূমিকম্প কিংবা অন্য কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যাতে মানুষকে নিয়ে এ পৃথিবী নড়াচড়া করতে না পারে। সে জন্য আল্লাহতা'য়ালা পাহাড়সমূহকে পেরেকের মতো গেড়ে দিয়েছেন বলে বর্ণনা করেছেন, এবং তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন যাতে পৃথিবী তোমাদের নিয়ে আন্দোলিত না হয়।-সূরা আন নাহল : ১৫। আমরা জানি, গাছ মানুষ ও পরিবেশের অকৃত্রিম বন্ধু। সবুজ গাছপালার ওপরই নির্ভর করে মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীর টিকে থাকা। এই গাছ ইচ্ছে হলেই কাটা যাবে না। কারণ 'গাছের প্রাণ আছে'- এটা হাদিসের বাণী। হাদিসে রাসূলে করিম (সা) থেকে জানা যায়, এক লোক যখন অকারণে একটি গাছের ডাল ভাঙে তখন নবী করিম (সা) সে লোকটির চুল মৃদুভাবে টান দিয়ে বলেন, তুমি যেমন শরীরে আঘাত পেলে ব্যথা পাও, গাছের পাতা বা ডাল ছিঁড়লে গাছও তেমন ব্যথা পায়। তাই পরিবেশের ভারসাম্যের জন্য গাছ লাগানোর শিক্ষা

আমরা মহানবী (সা)-এর হাদিস থেকে পাই। তিনি বলেছেন, যদি তুমি মনে করো আগামীকাল কিয়ামত হবে, তবু আজ একটি গাছ লাগাও। সুন্দর ও শৃংখলাপূর্ণ সামাজিক পরিবেশ গঠনে খাল-বিল, পুকুর-ডোবা, রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার থাকা অপরিহার্য। মানুষের প্রতি নবী বলেছেন, ঈমানের ৭৩টি শাখা, তন্মধ্যে সর্বোত্তমটি হলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আর সর্বনিম্নটি হলো, রাস্তা থেকে ক্ষতিকারক বস্তু দূরীভূত করা। তিনি আরো বলেছেন, পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ। হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলে করিম (সা) পানিতে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন। হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা লানত পাওয়ার তিনটি কাজ অর্থাৎ পানির ঘাট, রাস্তার মাঝে এবং বৃক্ষের ছায়াতলে মলত্যাগ থেকে বিরত থাক। বায়ু দূষিত হয়ে একজনের রোগ অন্যজনের কাছে স্থানান্তরিত হয়। আমরা অনেক সময় হাঁচি-কাশি দেয়ার সময় মুখ ঢাকি না। এতে করে নির্গত ময়লা ও জীবাণু দ্বারা অন্যের ক্ষতি হতে পারে। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলে করিম (সা) যখন হাঁচি দিতেন, তখন তিনি মুখ ঢেকে নিতেন। ফলে অন্যের ঘাড়ে দায়িত্ব চাপানোর আগে নিজের ঘাড়ে দায়িত্ব বুঝে নিই। শপথ নিতে হবে সবার এক সাথে। অন্যকে দেখিয়ে নয়, শপথ নিতে হবে নিজের বিবেকের কাছে। যেখানে-সেখানে ময়লা ফেলবো না, প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় করবো না, এমন করে দখল করবোনা, নদী-বন-পাহাড়।

দূষণ করবো না আমাদের প্রিয় এই পৃথিবীকে। আমাদের ছোট ছোট শপথে বদলে যাবে প্রিয় দেশ। বদলে যাবে আমাদের এই প্রিয় পৃথিবী। তাই এখনই সময়, মহামারি করোনা মোকাবেলার পাশাপাশি বৈশ্বিক উষ্ণতা প্রতিরোধে আমরা সবাই এক হই। আমাদের মনে রাখতে হবে, পৃথিবীতে মানুষকে টিকে থাকতে হলে, সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশের নিশ্চয়তা নিজেদেরকেই দিতে হবে। তাই পরিবেশ সংরক্ষণে ইসলামের অনন্য নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন করলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পেয়ে একটি সুস্থ পরিবেশ বিশ্বব্যাপী গড়ে উঠবে।♦